নতুন প্রহসন

সময়ের সুতোর গুলিটা যেন গড়িয়ে পড়ে গেছে কার কোল থেকে, সুতো খুলতে খুলতে এগিয়ে যাচ্ছে লাফ খেতে খেতে, ঘণ্টা-মিনিটগুলোর উপর দিয়ে। বড়ো যেন তাড়াতাড়ি লাফাচ্ছে।

সকাল থেকে দুপুরে পৌঁছে গেল দিনটা এর মধ্যেই।

আর একটু পরেই চারটে বাজবে।

বিকেল চারটে।

ইলাকে পৌঁছতে হবে সেইখানে সম্বুদ্ধ এসে অপেক্ষা করবে। অথচ ভয়ানক এখন আলস্য হচ্ছে ইলার, ইচ্ছে হচ্ছে এই নরম বিছানাটায় পড়ে লম্বা একটা ঘুম দিয়ে নেয়।

ঘুম। নরম মিষ্টি আর নিরুদ্বেগ একটু ঘুম। কত দিন যেন তেমন একখানা ঘুম ঘুমোয়নি ইলা। অনেক দিন। সেই যেদিন থেকে সম্বুদ্ধকে দেখেছে, সেদিন থেকে। দিনের শান্তি আর রাতের চিন্তা কেড়ে নিয়েছে সম্বুদ্ধ ইলার।

ইলার পাহাড়ি ঝরনার মতো বাধাবন্ধহীন নিরুদ্বেগ কৈশোর জীবনটা তরতরিয়ে এগিয়ে চলছিল নুড়ি ছাপিয়ে ওঠার গুঞ্জন গান গেয়ে, সম্বুদ্ধ এসে সামনে দাঁড়াল বড়ো একখানা পাথরের চাঁইয়ের মতো।

ওকে অগ্রাহ্য করে ভেসে বহে যাবে, এ পারছে না ইলা। আবর্ত উঠেছে ওকে ঘিরে ঘিরে। যন্ত্রণা আছে তার, আছে অস্বস্তি।

তবু সুখও আছে। অসহ্য সুখ!

'পূর্বজন্ম মানতে হচ্ছে আমায়,' ইলা বলেছিল সম্বুদ্ধকে, 'শত্রু ছিলে তুমি আমার। মহাশত্রু ছিলে পূর্বজন্মে।'

সম্বুদ্ধ অবশ্য এ অপমানে ক্ষুব্ধ হয়নি, বরং হেসেই উঠেছিল। হেসে হেসে বলেছিল, 'অথবা মহাজন। অধমর্ণ ছিলে তুমি আমার। ধার রেখে মরেছিলে। এ-জন্মে সেই ধার শোধ নিচ্ছি কড়ায়-গণ্ডায়।'

'মায় সুদ।' ইলা বলেছিল রেগে উঠে। আরও বলেছিল, 'কে আসতে বলেছিল তোমাকে আমার সামনে? কত সুখে থাকতাম যদি জন্মেও তোমার ওই হাড়-বিচ্ছিরি মুখটা না দেখতাম।'

'আমিও তোমার সঙ্গে একমত,' সম্বুদ্ধ গম্ভীর মুখটা নিয়ে বলেছিল, 'আমারও মনে হয় ও-কথা। ওই পোড়া কাঠের মতো 'তুমি' কে যদি না দেখতাম। এতদিনে—'

'এই, ভালো হবে না বলছি।'

'ভালো হবার কিছুই তো রাখনি। তোমার কবলে না পড়লে জীবনে কত কি ভালো ভালো ঘটতে পারত।'

'বটে না কি!' ইলা চোখ কুঁচকেছে, শুনি সেই ভালোর লিস্ট?'

'যথা, ভালো কনে, ভালো একখানা শ্বশুরবাড়ি, শ্বশুরের দেওয়া ভালো ঘড়ি, ভালো আংটি, ভালো ভালো যৌতুক—'

'ইস্! আশা কত! কোন্ শ্বশুরের দায় পড়ত তোমাকে জামাই করে ওই সব ভালো ভালো দিতে! কারুর যদি কানা-খোঁড়া একটা মেয়ে থাকত, হয়তো ভুলিয়ে-ভালিয়ে গছিয়ে দিত।'

দেখা হলেই ঝগড়া করা একটা রোগ ওদের। আর দেখা করবার জন্যেই ছটফটানি।

সকালবেলা ঘুম ভাঙা থেকে ঘুমের মধ্যের স্বপ্ন সব ভরে থাকে সেই চিন্তায়। কিন্তু শুধু এক-আধবার দেখা হওয়ায় ক'দিন আশ মেটে? সর্বদা দেখতে ইচ্ছে করে, আরও নিবিড় করে পেতে ইচ্ছে করে, কেড়ে নিয়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে ইলাকে ইলাদের বাড়ির ত্রিসীমানা থেকে।

'কিন্তু—' ইলা বলেছে, 'ওই বর্বর ইচ্ছেগুলোকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। কেড়ে নিয়ে পালাতে গেলে ছেড়ে দেবে না তোমাকে কেউ, তেড়ে গিয়ে হাতে হাতকড়া লাগাবে।'

'ওই তো! ওই দুঃখেই তো! দৈবাৎ তুমি এই বাইশের তিন রামদয়াল রোডে জন্মে ফেলেছে বলে যে, এদেরই সম্পত্তি হয়ে গেছ, এ-কথায় বিশ্বাসী নই আমি, অথচ মানতেই হচ্ছে সেই কথা।'

'তা হোক—' ইলা বলে, 'কোনো কিছু মানব না, এ-ইচ্ছেটা বুদ্ধিমানের ইচ্ছে নয়।'

অতএব বুদ্ধিমানের মতোই ইচ্ছেটা করে ওরা। সম্পর্কটা আইনসঙ্গত করে নেবার ব্যবস্থা করে। যাতে ইচ্ছে করলেই ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সেই চেষ্টাই করছে। কিন্তু সেটা কি এমন লুকিয়ে-চুরিয়ে ছিঁচকে চোরের মতো?

ইলা বলে, 'তুমি আমায় নিয়ে যাবে দেউড়ি দিয়ে রাজসমারোহে, সেটাই সুখ, সেটাই গৌরব—'

সম্বুদ্ধ হেসে ওঠে, 'দেবে সেই পাসপোর্ট তোমার রামদয়াল রোড?'

তবু ইলা বলেছিল, 'না হয় দিদি-জামাইবাবুকে বলি।'

সম্বুদ্ধ বলেছিল, 'খেপেছ! এ-সব ক্ষেত্রে কেউ নিরাপদ নয়। দিদি-জামাইবাবু তোমায় নিয়ে 'ফর অ্যাডাল্ট' দাগা বিলিতি প্রেমের সিনেমা দেখতে যায়, অথবা 'লেডি চ্যাটার্লির প্রেম' নিয়ে আলোচনা করে তোমার সঙ্গে বলে, ভেব না, তোমার প্রেমে পড়াকে অ্যালাউ করবে। সেরেফ তোমার মা-বাবাকে লাগিয়ে দিয়ে আমাদের পারানি নৌকোখানাকে বিশবাঁও জলে ফেলে দেবে।'

ইলা মুখ ভার করে বলে, 'সত্যি, কি সেকেলেই আছে এখনও আমাদের দেশ! বিশেষ করে এ-ব্যাপারে!'

সম্বুদ্ধ অবশ্য হাসে। বলে, 'শুধু আমাদের দেশ নয়, পৃথিবীর সব দেশেই।'

'সব দেশেই? কী যে বল? ওদেশে—'

'ওদেশের প্রগতিশীলতার নমুনা শুধু এইটুকু—গার্জেনের অনুমোদিত পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে যদি ওদের মেয়ে-ছেলেরা প্রেমে পড়ে, তাহলে ওরা খুব পিঠ চাপড়ায়। নচেৎ রাগারাগি, বকাবকি, সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত ইত্যাদি পুরনো পদ্ধতিগুলো ঠিকই আছে। আর আমাদের দেশে প্রেমটাই অননুমোদিত। সবটাই রাগারাগির—'

'তবু ওরা রাগারাগির ধার ধারে না। নিজেরা বেরিয়ে পড়ে।'

'সেটা আমরাও করতে পারি। কোনো কিছুর ধার না ধারলে আর চিন্তা কি? তবে আমরা না হোক, তোমরা অনেক ধার ধারতে চাও।'

সম্বুদ্ধ হেসে কথাটা শেষ করে, 'মা-বাবা যদি আর তোমার মুখ না দেখেন, এই ভেবে তোমার ভয়, দিদি-জামাইবাবু পাছে তোমায় ধিক্কার দেয়, তাতে তোমার ভয়, অতএব এই চোরের পথ ধরা।'

আজ সেই দিন। চোরের পথ ধরে বিয়ে করতে যাবে ওরা। বিকেল চারটের সময় প্রতীক্ষা করবে সম্বুদ্ধ। আর ইলার এখন কিনা ইচ্ছে দুপুরের নির্জনতায় জানলা-দরজা বন্ধ করে নরম ছায়াময় ঘরে একটু গা ছেড়ে-দেওয়া ঘুম দেয়।

তবু সে-ইচ্ছেকে বাদ দিয়ে উঠতেই হল ইলাকে। চুল বাঁধল, প্রসাধনের টুকিটাকি সেরে নিল, তারপর নিত্যদিনের সাজ সেজে বেরিয়ে পড়ল পৌনে চারটের চড়া রোদ্দুরে।

প্রায়ই এ-সময় ন্যাশানাল লাইব্রেরিতে যায় ইলা, কাজেই ইলার মা অমলা প্রশ্ন করলেন না। শুধু বললেন, 'উঃ, যা রোদ! একটা ছাতা নিলে পারতিস।' বলে পাশ ফিরে শুলেন।

ছাতা ইলা নেয় না। কোনোদিনই নেয় না, তবু অমলা রোজই বলেন। আর রোজই ইলা সে-উপদেশ উড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। ভাবে, বয়েস হলেই মানুষের উপদেশ দেওয়ার ইচ্ছেটা এমন বাড়ে কেন! কিন্তু আজ তা ভাবল না।

আজ মায়ের ওই উপদেশ-বাণীটুকুর মধ্যেই যেন অবাধ একটা স্নেহের স্পর্শ পেল ইলা, আর চোখের কোলে এক ঝলক জল এসে গেল।

অকৃতজ্ঞ! অকৃতজ্ঞ!

ইলার মতো এমন অকৃতজ্ঞ মেয়ে আর ক'টা আছে? যদিও সম্বুদ্ধ অনেক উদাহরণ দেখিয়েছে তাকে এমন গোপন বিবাহের, এবং পরে আবার সব ঠিক হয়ে গেছে, সে-উদাহরণও দেখিয়েছে, তবু ইলার ওই কথাই মনে এল। আর সত্যিই ঘরের কোণ থেকে ছাতাটা টেনে বের করে ঠুকে ধুলো ঝেড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

খানিক পরে, চোখের জল শুকোলে মনে পড়ল সম্বুদ্ধ নিশ্চয় হাসবে। বলবে, 'হঠাৎ? ছাতার আড়ালে আত্মগোপন নাকি?'

উত্তরটা প্রস্তুত করে রাখল ইলা। বলবে, 'তা নয়। রোদে ঘেমে কালো হয়ে যাই, এ ইচ্ছে নেই আজ।'

ওদের প্রোগ্রামে আছে, রেজিস্ট্রি-অফিস থেকে বেরিয়ে কোথাও ঢুকবে দুজনে একসঙ্গে খেতে। এই।

এর চাইতে বেশি কোনো অনুষ্ঠান আর কি সম্ভব? কিন্তু শুভরাত্রিটা?

ফুলশয্যার সেই অনুষ্ঠানটা? সেও কি শূন্য একটা সন্ধ্যার যন্ত্রণার মধ্যেই সমাপ্ত হবে? কোনো কিছু উপায় নেই?

খেতে ঢুকল ওরা দুজন, আর উইটনেস্ দুজন। অসীম আর কুমকুম। দুজনেই এদের দুজনেরই বন্ধু।

আর ওরা নিজেরাও পরস্পরের বন্ধু হয়ে উঠেছে যেন ক্রমশ। তবে ওদের আর এদের মতো লুকোচুরির সুড়ঙ্গ পথ ধরতে হবে না। ওদের দুজনেরই প্রগতিশীল বাড়ি।

তা, ওরাই উপায়টা বাতলাল। বলল, একটা নেমন্তন্নর ব্যাপার ঘটানো ছাড়া উপায় নেই, এবং সেটা যাতে বেশ খানিকটা সময় আহরণ করতে পারে।

কুমকুম বলল, 'বেশ, আমি নেমন্তন্ন করছি গিয়ে। বলব তোর মাকে, বাড়ি থেকে আমরা সবাই আমাদের চন্দননগরের বাড়িতে যাচ্ছি, ইলাও চলুক আমার সঙ্গে। ফিরতে রাত হয়ে গেলে ভাববেন না। তারপর অবশ্য কোনো আকস্মিক অনর্থপাতে রাত হয়ে যাবে। আমি বাড়ি থেকে ফোন করে দেব, ইলা আজ এখানেই—'

ইলা রাগ করে বলে, 'আমাদের বাড়িতে ফোন কোথায়?... আর সে তুই যতই খবর দিস, বাবা ঠিক এসে হাজির হবেন। রাত দুটো বাজলেও।'

'বেশ, তবে বলব চন্দননগরে থাকা হবে একটা রাত।'

ইলা মাথা নেড়ে বলল, 'তাহলে তো আসতেই মত দেবেন না।'

সম্বুদ্ধ বলে, 'ঠিক আছে। চল, এখনই গিয়ে দুজনে প্রণাম করে আসি, সব গোল মিনটে যাক।'

ইলা শিউরে উঠে বলল, 'ওরে বাবা! সে অসম্ভব।'

'তবে নিরীহর মতো যাবি চন্দননগরে, রাতে ফিরবি না। আমি সকালে তোকে এনে দেব সঙ্গে করে, বলব রাতে ভীষণ জ্বরে ধরেছিল—'

হেসে গড়িয়ে পড়ে কুমকুম।

কিন্তু ইলা এই হাসি-তামাশার মধ্যে নিজেকে পৌঁছতে পারে না। ইলার বুকের মধ্যে ভয়ানক একটা যন্ত্রণা ধাক্কা দিচ্ছে। ইলা যেন এখন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারলে বাঁচে।

এদের কাউকেই এখন ভালো লাগছে না। অসীম কুমকুম কাউকে না।

মনে হচ্ছে এতদিন ধরে ওরাই যেন তাকে প্ররোচনা দিয়ে দিয়ে একটা বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

সম্বুদ্ধও। সম্বুদ্ধকেও যেন এখন ভয়ের মতো মনে হচ্ছে।

তাই ইলা কুমকুমের হাসির পর নীরস স্বরে বলে, 'ও-সব কথা রাখ, ও হবে না! রাত দশটা সাড়ে-দশটার মধ্যে যাতে ফেরা যায় সে-রকম কোনো ব্যবস্থা—'

সম্বুদ্ধও প্রায় রেগে ওঠে।

সম্বুদ্ধ বলে, 'তা তোমার যখন এত অসুবিধে, তখন থাক না হয়।'

ইলা ভ্রূভঙ্গি করে। বলে, 'তা, তোমার যদি খুব সুবিধে থাকে তো চল না তোমাদের বাড়িতেই। তোমার বউদিরা ফুলের বিছানা পেতে রাখুন, বরণডালা সাজিয়ে বসে থাকুন। আমি বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে গিয়ে উঠছি।'

সেটা হবে না।

এইটাই হচ্ছে কথা। অগাধ লোক সম্বুদ্ধদের বাড়িতে। আর তারা নাকি মারাত্মক রকমের সেকেলেপন্থী। এখনও ব্রাহ্মণ-কায়স্থে বিয়ে অনুমোদন করে না। সম্বুদ্ধ যে এই বিয়েটা করেছে, সে শুধু শীঘ্রই একটা ভালো পোস্ট পেয়ে মাইশোরে চলে যেতে পারবে বলে। যতদিন না যাচ্ছে, ততদিন যা হোক করে—

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, শুধু কুমকুমের বাড়িতে নেমন্তন্নর ছুতো করে রাত দশটা পর্যন্ত কোনো একটা হোটেলে গিয়ে—

'একবার অন্তত একত্র রাত্রিবাস না হলে বিয়েটা মঞ্জুর হবে কি করে?'

কুমকুম হেসেই অস্থির, 'কী ভীতু তুই বাবা! বিয়ে হয়ে গেল, তবু এখনও এত ভয়?'

চুপি চুপি কানে কানে বলল ইলার। বলল, 'এখনও কি পরপুরুষ বলে মনে হচ্ছে নাকি রে? কৌমার্য-ভঙ্গের অপরাধে কেস্ করবি?'

ইলা আরক্ত মুখে বলল, 'থাম। অসভ্যতা করিসনে।' আর মনে মনে বলতে লাগল, সে-কথা তো অস্বীকার করতে পারছি না। বিয়ে হয়ে গেছে, এ-অনুভূতি কই আমার?

প্রতিদিনের চেহারায় নতুন কি রঙ লাগল?

তারপর ভাবল, ছি ছি! লুকোচুরি করে আবার বিয়ে! নাঃ, আজই খুলে বলব। যা থাকে কপালে। মায়ের কাছে হয়তো পারব না, দিদির কাছে বলব।

তারপর অকারণেই নিজেকে ভারী দুঃখী মনে হল ইলার। যেন কে ওকে খুব বড়ো ঠকানো ঠকিয়েছে।

ওই, ওই লোকটা। ভালোমানুষের মতো বসে আছে এখন।

ওই তো 'বিয়ে বিয়ে' করে এত অস্থির করেছে।

অবশ্য তার দিকে যুক্তি এই—তুমি যখন বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত অপাপবিদ্ধা থাকতে চাও, পৃথিবীর ধূলি-মালিন্যের ছায়া দেখলে শিউরে ওঠ, তখন, বিয়েটার জন্যে ব্যস্ত হওয়া ছাড়া উপায় কি আমার?

তা কই? বিয়ে হলেই বা কী লাভের আশা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে?

আসল কথা, রাজপথ ছেড়ে গলি রাস্তা ধরলে হবেই অসুবিধে।

বিয়ে। বিয়ে না ছাই। মনে মনে ভাবতে থাকে ইলা, একে আবার বিয়ে বলে। সকাল থেকে সাতবার খেয়ে, নিত্যি-পরা একটা শাড়ি পড়ে নিজে নিজে এলাম আমি বিয়ে করতে! ছিঃ! জীবনের এই পরম শুভদিনে, মা-বাপের সঙ্গে পঞ্চাশ গণ্ডা মিথ্যে কথা বলতে হচ্ছে আমায়। আর—আর স্বামীর কাছে প্রথম আত্মনিবেদনের রাত্রিটি আসবে অবৈধ মিলনের আতঙ্কিত কুৎসিত চেহারা নিয়ে।

বারে বারেই চোখে জল আসে ইলার।

গল্পে মন বসে না, পরামর্শে মন বসে না। ইলা বলে, 'আমি যাই এবার।'

'আমরা ঠিক করেছিলাম চারজনে একটা সিনেমা দেখে তবে—'

'না-না, মা-র কাছে ধরা পড়ে যাব।'

সম্বুদ্ধ রাগ করে। কিন্তু বলতে পারে না,—পড় ধরা, আমি আছি।

ও থাকবে। পরে থাকবে।

যখন মাইশোরের চাকরিটার তারিখ আসবে, এখানের কাজের তারিখ শেষ হবে। তখন সম্বুদ্ধ ইলার মা-বাপের নাকের সামনে বিয়ের এই দলিলটা ধরে দিয়ে, তাঁদের মেয়েটাকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাবে। এই পরিকল্পনা সম্বুদ্ধর। নিজের বাড়ির সামান্যতম সাহায্যমাত্র নেবে না। কেউ যেন বলতে না পারে 'ঠাকুরপোর বিয়ে দিলাম আমরা।'

দিদির বাড়ি ইলাদের বাড়ির কাছেই।

ইলা ভেবেছিল আগে দিদির বাড়ি নেমে দিদির কাছে অপরাধ ব্যক্ত করে ফেলবে।

হয়ে গেছে বিয়ে, আর তো লাগিয়ে দিয়ে তাদের জীবন-তরণীকে বিশবাঁও জলে ঠেলে দিতে পারবে না দিদি-জামাইবাবু।

বলবে। না বলে থাকতে পারবে না।

এতখানি ভার বহন করে ঘুরে বেড়ানো বড়ো কঠিন। কিন্তু হল না।

শুনল দিদিরা ও-বাড়িতেই গেছে।

বলল দিদির বাড়ির চাকর।

শুনে হঠাৎ পা থেকে মাথা পর্যন্ত নিথর হয়ে এল ইলার। কেন! কেন হঠাৎ?

এ-ঘটনা যে সপ্তাহে চার-পাঁচ দিন ঘটে, সন্ধ্যাবেলা যে দিদি বাপের বাড়ি, আর জামাইবাবু শ্বশুরবাড়ি গিয়ে বসে থাকে, সে-কথা মনে পড়ল না ইলার। ওর মনে হল সব বোধ হয় ফাঁস হয়ে গেছে।

আর ওঁরা সবাই একত্রিত হয়ে বোধ হয় ইলার জন্যে ফাঁসি-কাঠের ব্যবস্থা করছেন।

সম্বুদ্ধ যে ওকে আশ্বাস দিয়েছিল, আইনত তোমায় কিছু করতে পারবেন না ওঁরা, তুমি নাবালিকা নও। বড়োজোর বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারেন। তা সেও লোকে পারে না। কেলেঙ্কারির ভয় আছে। লোকলজ্জার ভয় আছে। ওইখানেই জব্দ গার্জেনরা—সে আশ্বাসও কাজে লাগছে না।

পালাবে? কিন্তু কোথায়?

কে বরণডালা নিয়ে বসে আছে ইলার জন্যে?

আস্তে আস্তে বাড়ি এল।

বাইরে থেকে জামাইবাবুর দরাজ গলার হাসি শুনতে পেল।

যাক, তবে পরিস্থিতি খুব খারাপ নয়। বোধ হয় ফাঁস হয়ে যায়নি।

স্বস্তিবোধ করে এগিয়ে আসে, আর আবার সেই হাসির আওয়াজ যেন বসবার ঘরটার ছাদ

ভেদ করে। ওই রকম আমুদে মানুষ হেমন্ত। দরাজ হাসি, দরাজ গলা, প্রচুর খাওয়া, প্রচুর স্বাস্থ্য। জামাইবাবুকে ইলার খুব ভালো লাগে।

কিন্তু আজ হঠাৎ জামাইবাবুর ওপর খুব একটা হিংসে হল ইলার।

শ্বশুরবাড়িতে এসে দিব্যি জমিয়ে বসেছেন ভদ্রলোক। প্রায় রোজই আসেন, তবু মায়ের জামাই-আদরের কমতি নেই।

জামাতা না দেবতা!

অথচ ইলার বর এই আদরের কণিকাপ্রসাদও পাবে না। ইলার বর কোনোদিন এ-বাড়িতে এমন জমিয়ে বসে দরাজ গলায় হাসতে পাবে না।

অথচ সম্বুদ্ধ কম বাক্যবাগীশ নয়। কথায় তার ছুরির ধার।

মা বলেন, 'আমার বড়ো জামাইটি যেমন, ছোটোটি যদি তেমন হয় তবেই আমোদ। তা এমনটি কি আর হবে? হয়তো গোমড়ামুখোই হবে।'

মা-র সেই ছোটো জামাইয়ের মুখটা কেমন, তাই দেখবেন না মা।

এ-বাড়িতে কি কোনোদিন আসেনি সম্বুদ্ধ?

এসেছে।

বাইরে দাঁড়িয়ে থেকেছে, ইলার ছোটো ভাই কি চাকরের সঙ্গে কথা বলেছে। কথা আর কি, ইলাকে ডেকে দেওয়ার কথা। একদিন ইলার বাবা দোতলার বারান্দা থেকে দেখেছিলেন। বলেছিলেন, 'নীচে ছেলেটি কে সেই থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে?'

ইলা বলেছিল, 'ওঁর ভাগ্নীর সঙ্গে পড়েছিলাম আমি, লাইব্রেরির একখানা বই ছিল ওঁর কাছে—'

তাড়াতাড়ি নেমে গিয়েছিল ইলা এই ফাঁকা উত্তরটা দিয়ে।

পরে বলেছিল সম্বুদ্ধকে 'কিরকম প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তা বল? আমাদের ক্লাশের নন্দিতা বলে একটা মেয়ে বলেছিল, 'ওই যে কবিতা-টবিতা লেখেন সম্বুদ্ধ ঘোষ, উনি আমার সম্পর্কে মামা হন।' কাজে লাগিয়ে দিলাম কথাটা। তা ছাড়া লাইব্রেরির বইটাও দিলাম ঢুকিয়ে।'

কিন্তু এত বুদ্ধি প্রকাশ করেই কি পার পেয়েছিল নাকি ইলা? পরে বারবার জেরা করেননি ইলার বাবা? ছেলেটি কে? কোথায় থাকে? নাম কি? ইত্যাদি।

এমনভাবে বলেছেন, যেন জেরা নয়, শুধু গল্প করা।

নামটা শুনে ভুরুটা একবার কুঁচকে ছিলেন। কিন্তু এ-কথাটা তো বলতে পারেননি, 'ঘোষেদের ছেলের সঙ্গে মেশবার এত কি দরকার তোমার?'

তাই বলেছিলেন, 'রাস্তায় ঘোরে, এটা দেখতে ভালো নয়। বাড়িতে এনে বসাও। তোমার মা-র সঙ্গে আলাপ করে দিও। খুশি হবেন।'

ইলা বলতে পারেনি খুশি হবার মতো কি পাবেন মা-বাবা? মা তো কারও সামনে বেরোতেই চান না। এখনও সেই মধ্যযুগীয় প্রথায়।

বড়ো জামাইয়ের সঙ্গেও প্রথম প্রথম ঘোমটা দিয়ে কথা বলতেন ইলার মা। এখন খুব 'ফ্রী'। সম্বুদ্ধর সঙ্গে মা-র এই ফ্রী কি জীবনে আসবে?...যদি সম্বুদ্ধর কথামতো পরে ভবিষ্যতে 'সব ঠিক হয়ে যায়ও'।

হয় না। কাটা গাছ জোড়া লাগে না।

ভাঙা মন ঠিক খাপ খায় না।

ঘোষের ছেলেকে কিছুতেই সমাদরে 'জামাই' বলে গ্রহণ করবেন না অমলা!

হিংসের নিশ্বাসটা ত্যাগ করে আস্তে ঘরে এসে ঢুকল ইলা।

আর সঙ্গে সঙ্গে আর একবার মনে হল তার এই সুখস্বর্গ থেকে স্খলিত হয়ে পড়েছে সে। এই জমজমাট মজলিশের মাঝখানে কোনোদিন আর এসে বসতে পারবে না।

ইলা দুঃখী। ইলা নির্বোধ।

ওকে দেখেই দিদি হইহই করে উঠল। 'এতক্ষণে আসা হল মেয়ের! কোথায় থাকিস সন্ধে পার করে?'

'ওই তো,' অমলা বলে ওঠেন, 'রোজ সেই ন্যাশনাল লাইব্রেরি। কী যে এক রিসার্চ ধরল! চেহারা হয়েছে দেখ না! সেই ভর দুপুরে বেরিয়ে—নিসনি তো ছাতা!'

ছাতা।

এতক্ষণে মনে পড়ল ইলার, ছাতা বলে একটা বস্তু ছিল তার কাছে। ছিল, এখন আর নেই। কে জানে কোথায় পড়ে আছে। অতএব একটু হাসল। দিদি বলল, 'এখন আর দেরি করে লাভ নেই, উঠছিলাম। এই চটপটই বলি—একটি ছেলের ফটো এনেছি, দেখ দিকি কিরকম লাগছে? পছন্দ অপছন্দ খুলে বলিস বাপু। তোর জামাইবাবুর আবার অনেক ঢং কি না। বলেন, আগে ছোটোশালী পাত্রের চেহারাটা অ্যাপ্রুভ করুক, তারপর কথা পাড়া যাবে।'

ইলার মাথা থেকে পা অবধি একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহে যায়।

ছেলের ফটো!

বিয়ের তোড়জোড়! হঠাৎ আজই!

এটাই কি তাহলে এদের শাস্তির ধরন নাকি? ফাঁস হয়ে গেছে ইলার গোপন তথ্য, সেটা নিজেরা জেরা না করে ইলার মুখ থেকেই বার করতে চায়? নইলে আজই কেন? বুক কেঁপে ওঠে ইলার, তবু মুখে হারে না। বলে 'জামাইবাবুর বিবেচনার শেষ নেই। তবে বিবেচনাটা মাঠে মারা গেল। আমি ওই সব পাত্রাপাত্রের মধ্যে নেই।'

ইলার বাবা ছিলেন না ঘরে, মা ছিলেন। বলে উঠলেন বেশ একটু ঝঙ্কার দিয়েই। 'তা থাকবে কেন? দুপুর রোদ্দুরে টো টো করে ঘুরে শুধু বস্তা বস্তা বই গিলবে।'...

মা হঠাৎ আজকেই দুপুর রোদ্দুরের কথা তুললেন। অথচ প্রায়ই তো যায় ইলা।

নির্ঘাত।

নির্ঘাত।

ওঁরা কিন্তু আর বেশি বললেন না।

ইলার দিদি নীলা বলল, 'যথেষ্ট আদিখ্যেতা হয়েছে, রাখ তুলে। ফটোটা নিয়ে যা, ঘরে রাখ গে, নির্জনে বসে দেখগে যা।'

হেমন্ত বলে, 'আর সেই যে ছেলের গুণাবলী লিপিবদ্ধ করে এনেছিলে, সেটাও দিয়ে দাও শালীকে। এক সঙ্গে রূপ-গুণ দুইয়েরই বিচার হয়ে যাক।'

'হুঁ, তোমার যত অসভ্যতা!' নীলা বলে, 'ওটা বাবাকে দেখাব বলে নিয়ে এসেছি—'

'আহা বুঝলাম! কিন্তু যে-মহিলা বিয়েটা করবেন তাঁকে আগে দেখানোই যুক্তিসঙ্গত।'

তা, যুক্তিসঙ্গত কাজই করে নীলা। ইলার শোবার ঘরের টেবিলে ছবিটা আর লেখাটা রেখে দিয়ে আসে।

লজ্জাশীলা এখন লজ্জা করছেন, একা ঘরে নিবিষ্ট হয়ে দেখবেন।

ছবি হেমন্তর অফিসের এক সহকর্মীর ভাইপোর। সম্প্রতি 'ওদেশ' থেকে ঘুরে এসেছে, এদেশ থেকে যথারীতি শিক্ষাদীক্ষা শেষ করে।

ইঞ্জিনিয়ার ছেলে, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আর চেহারাখানা দেখুক ইলা।

'রঙ অবিশ্যি ফরসা নয়' বলে গেছে নীলা। সঙ্গে সঙ্গে এও বলেছে, 'পুরুষ-মানুষের ফরসা রঙ একটা কুদৃশ্য।'

হেমন্তর রঙ ফরসা।

তাই এই ধারালো কটাক্ষ নীলার।

দুপুর রোদ্দুর থেকে পরা শাড়ি-ব্লাউজ বদলাতে ইচ্ছে করছিল ইলার, কিন্তু কী যে এক লজ্জা এল! মনে হল, মা হয়তো ভাববেন মেয়ে ওই ছবিটা দেখবে বলেই শাড়ি বদলানোর ছুতো করে ঘরে ঢুকল।

অথচ এই আজই ইলার বিয়ের এই তোড়জোড় দেখে তো হাসিই পাবার কথা।

বারবার ইচ্ছে হল ইলার, মনে মনে খুব হাসে। হাসে এঁদের এই গতানুগতিক প্রথার পথ ধরে মেয়ে পারের চেষ্টা দেখে, মেয়ে যে ইতিমধ্যে ডানা ঝাপটে উড়ে গেছে, একথা ভেবে হাসে, কিন্তু পারে না।

বরং ভয়ানক যেন একটা অভিমান আর আক্রোশ আসে। বলতে ইচ্ছে করে, এতদিনে টনক নড়ল তোমাদের? ক'টা দিন আগে হলেও হয়তো এমন করে ঝাঁপিয়ে পড়তাম না।

ক'টা দিন কেন, কাল, গত কাল রাত্রেও যদি দিদি আসত, হয়তো আপাতত পিছিয়ে রাখতাম সম্বুদ্ধকে।

আজ, আজ আসার বাসনা হল দিদির।

তারপর হঠাৎ খেয়াল হল এই চিন্তাগুলো সম্বুদ্ধর প্রতি তার নিষ্ঠার পরিপন্থী।

ছি ছি, এসব কি ভাবছে সে!

বরং ভাবা উচিত, ভাগ্যিস বাবা-মা এর আগে মেয়ের বিয়ের চিন্তা করতে বসে যাননি। তাহলে হয়তো লড়াইয়ের মুখে পড়তে হত।

কোথাকার কে এক ইঞ্জিনিয়ার—তার ছবি দেখতে আমার দায় পড়ে গেছে।

শাড়ি বদলাতে গেল খেতে বসার আগে। দিদি চলে গেছে তখন।

তাড়াতাড়ি চলে এল, কিছুতেই না মা ভাবতে পারেন ছবিটা দেখছে ইলা।

খিদের নাম ছিল না, তবু 'খাবে না' বলতে অস্বস্তি। যদি মা প্রশ্ন করেন, 'খিদে নেই কেন? কোথাও কিছু খেয়ে এলি বুঝি?' তাই খেতে বসা।

বিয়ে করে বেরিয়ে 'বিয়ে হওয়া বিয়ে হওয়া' ভাব মনে আসেনি, এল এখন। মায়ের সঙ্গে খেতে বসে।

ঠিক বিয়ে হয়ে যাওয়ারই যে অনুভূতি তাও নয়, তবু কিছু যেন একটা হয়ে যাওয়া। কেন আজ সকালে যে-ইলা মায়ের সঙ্গে খেতে বসেছিল, সে-ইলা নয় সে। এখনকার এই ইলা, অন্য ইলা, আর একজন ইলা।

মায়ের সঙ্গে যেন বহুযোজন দূরত্ব এসে গেছে এ-ইলার। খেতে বসে দুই মায়ে-ঝিয়ের সেই প্রাণ-খোলা আর গলা-খোলা গল্পের স্রোত যেন আর বইবে না। যেন বড়ো একখানা পাথরের চাঁই এসে পড়েছে তার মুখে।

'খাচ্ছিস না তো মোটে—'

বললেন অমলা।

ইলা বলল, 'খাচ্ছি তো!' খেতে লাগল জোর করে।

মা মনে মনে হাসলেন। ভাবলেন, হঠাৎ বিয়ের কথা শুনে মনটা উচাটন হয়েছে।

হবে, হতেই পারে।

অমলার যখন প্রথম বিয়ের কথা হয়েছিল, সাতদিন খেতে পারেনি ভালো করে।

হেমন্তর যেমন কাণ্ড, আগে কনে পাত্র পছন্দ করবে, তবে নাকি বিয়ের প্রস্তাব। শুনেও বাঁচি না। ক্রমশ দেশের চাকা যেন ঘুরে উলটে গেছে। তা, এ-ছেলেকে আর অপছন্দ করতে হয় না। গুণেই তো পছন্দ। তাছাড়া দেখতেও ভালো। রঙ ময়লা বলেছে, সে তো ফটোতে তত বোঝাও যাচ্ছে না। এমনিতে নাক-মুখ-চোখ পরিষ্কার তীক্ষ্ণ, যাকে প্রশস্ত ললাট বলে, তাই। আর সবটা মিলিয়ে একটা বুদ্ধিদীপ্ত পরিচ্ছন্নতা। অমলার খুব ভালো লেগেছে।

অমলার মেয়েরও লাগবেই।

তা, অমলার অনুমান হয়তো মিথ্যা নয়। অমলার মেয়ে সেই ছবিখানা হাতে নিয়ে বসে রয়েছে দীর্ঘ একটা সময়। রাত্রে ঘুমের সময়।

অমলার ঘরের পাশেই ইলার এই ছোট্ট ঘরটা। মাঝখানে দরজা, পরদা ফেলা থাকে। মানে থাকত।

সম্বুদ্ধর সঙ্গে ভাব হবার পর থেকেই কৌশলে ওই দরজাটা বন্ধ করে রাখার ব্যবস্থা করে ফেলেছে ইলা। বলে, পড়ার অসুবিধে।

কেন?

খুব স্পষ্ট একটা কারণও অথচ নেই। মাঝে মাঝে চিঠি লেখার শখ ইলার, তাই লেখে। সেটা কিছু না। আসলে নিজেকে একলা করে নিয়ে বসার একটা আলাদা সুখ, আলাদা রোমাঞ্চ।

মাঝখানের দরজা খোলা থাকলে মনে হয় যেন ইলার চিন্তাগুলো মা-র কাছে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। যেন মায়ের চোখ ইলার নিভৃত হৃদয়ের দরজায় এসে দৃষ্টি ফেলছে। পরাধীনতার একটা বন্ধন যেন লেগে থাকে সর্বাঙ্গে। দরজার ছিট্‌কিনি লাগিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন লাগে।

তাই এ ব্যবস্থা করে নিয়েছে।

আজও দরজাটা বন্ধ করে দিল। বেশ একটা নিশ্চিন্ত সুখের আশা পেল যেন। বসল বিছানায়।

ভাবল ওই ছবি ওখানে থাক পড়ে। দায় পড়েনি আমার কার-না-কার একটা ছবি দেখতে। আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল না।

বসেই রইল।

বসে থাকতে থাকতে মন ঘুরে গেল। ভাবল, দেখলেই বা কী?

ওই একটা ছবি দেখা না-দেখায় আমার কি এসে যাবে? বরং ওই না দেখে ফেলে রাখাটাই ওকে বড়ো বেশি গুরুত্ব দেওয়া যেন।

নিক্তির কাঁটা এদিকে ঝুঁকল।

ছবিখানা অবহেলাভরে হাতে তুলে নিল। একবার দেখেই ফেলে রাখল। তারপর আবার যেন নতুন কিছু একটা কৌতূহলে ফের তুলে নিল।

তারপর দেখছে।...দেখে দেখে যেন শেষ হচ্ছে না।

মুখ-চোখ মন্দ নয় লোকটার।

নেহাত বোকাটে বলেও মনে হচ্ছে না।...বিলেত-ফেরত ইঞ্জিনিয়ার শুনছি, বোকা হবার কোনো কারণও নেই অবশ্য।

তা, কনে একটা ভদ্রলোকের জুটবেই ভালো মতো।

ওদের বাড়িটাও ভালো বলেই বোধ হয়। সম্বুদ্ধদের মতো গোয়ালবাড়ি নয়। ভালো ভাবছি এই জন্যে, মা-বাপ আছে বলছিল দিদি, আর সে মা-বাপ যখন খরচা করে বাইরে পাঠিয়েছে ছেলেকে, ভালো হওয়াই স্বাভাবিক।...

নিজেদের জানাশোনা কারুর সঙ্গে বিয়েটা হলে মন্দ হত না। একটা জানা মেয়ের ভালো বিয়ে হত।

জানা মেয়ে খুঁজতে লাগল মনে মনে। হরিকাকা, মেয়ের বিয়ে বিয়ে করে পাগল হচ্ছেন।

হন বাবা! এই রূপে-গুণে আলো করা ছেলের সঙ্গে হরিকাকার মেয়ে! ছি ছি! বিদ্যে-বুদ্ধির বালাই মাত্র নেই মেয়েটার।

ন-মামার মেয়ে অতসী?

নাঃ, সে মেয়ে তো একটি ফ্যাশনের অবতার।

কেন একটা ভালোমানুষ ছেলের মাথাখাওয়া হবে!

বেলামাসির মেয়েটাও বিয়ের মতো হয়েছে, কিন্তু টাকাই আছে বেলামাসিদের, 'কালচার' নেই।

তবে কে? তবে কাকে?

আরও অনেক মাসি-পিসি-কাকার কথা মনে মনে তোলপাড় করল ইলা। যাঁরা নাকি মেয়ের বিয়ের কথা বলে থাকেন। একটাকেও পছন্দ হল না। কোনোটাকেই যোগ্য মনে হল না।

এই সভ্য-ভব্য মার্জিত চেহারার লোকটার সত্যিকার একটা ভালো কনে হওয়া উচিত।

কে কোথাকার ওই লোকটার কনের চিন্তায় ইলা কেন মাথা ঘামাচ্ছে, সে কথা ভাবল না ইলা।

আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ার পরও আরও অনেকক্ষণ ঘামাতেই লাগল মাথা।

পরদিন স্নান করে এসে প্রথম চমক লাগল আরশির সামনে দাঁড়িয়ে।

বিয়ে হয়ে গেছে ইলার। অথচ সিঁথিতে এখনও কুমারীর নির্মল শুভ্রতা।

সিঁদুর এক প্যাকেট এনেছিল কুমকুম, বলেছিল বাইরে এসে সম্বুদ্ধ আংটি করে লাগিয়ে দেবে—আভাসে।

ইলা রাজী হয়নি। বলেছিল, 'জীবনে প্রথম সিঁদুর পরব যেখানে সেখানে?' বলেছিল, 'থাক, ওই শুভরাত্রি না কি ওই দিনই যা হয় হবে।'

তবু আজ সিঁথিটা দেখে মনটা কেমন করে এল। ইলার যদি সহজ স্বাভাবিক বিয়ে হত, আজ ইলার চেহারায় লাগত কী অপূর্ব রঙের ছোঁয়াচ। লাল শাড়িতে মহিমান্বিত নববধূ মূর্তির সিঁথির সেই অরুণ-রাগ, সারা মাথাটাই যাতে লালে লাল হয়ে গেছে, সেই মূর্তিটার বিরহ লাগল যেন ইলার। ইলা তাই আবার স্নানের ঘরে গিয়ে চোখে জল দিয়ে এল চোখের জল ঢাকতে।

ছবিখানা এখনও পড়ে আছে টেবিলে।

উলটো করে রেখে দিয়েছে ইলা।

খুলে রেখে মনে হচ্ছিল, ও যেন ইলার মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গ-হাসি হাসছে।

এখন আর দেখতে পাচ্ছে না, তবু রাস্তায় হঠাৎ দেখতে পেলে ঠিক ওকে চিনে ফেলতে পারবে ইলা। ছবির মুখের প্রত্যেকটি রেখা যেন মুখস্থ হয়ে গেছে ইলার।

ইলার নিজের কোনো সিঁদুর কৌটো নেই।

মায়ের ঘরে এসে কৌটোটায় হাত দিল। লুকিয়ে চুলের মধ্যে পরবে নাকি একটু!

ধ্যেৎ। প্রথম সিঁদুর নিজে নিতে আছে নাকি!

তর তর করে দোতলা থেকে নীচে নেমে এল ইলা, মাকে বলল, 'মা, কুটনো কোটা হয়ে গেছে তোমার? আমায় কেন ডাকলে না?'

মা বললেন, 'তুই অনেক রাত অবধি পড়াশোনা করছিলি, তাই আর ডাকিনি। ভারী তো কুটনো, ও আর আমার কতক্ষণ।'

কথাটা সত্যি।

অমলার দরকার হয় না মেয়ের সাহায্য নেবার।

ভারী পরিশ্রমী অমলা।

নিপুণ হাতে সংসার করেন। স্বামী-সন্তানদের প্রতি যত্নের অবধি নেই।

ইলা ভাবল মা-র বিয়েটা গতানুগতিক প্রথাতেই হয়েছিল। প্রেমে পড়ার যে কী রোমাঞ্চ, কী অনির্বচনীয় অনুভূতি, এ-সবের স্বাদ জানেন না মা।

অথচ মা সুখী, সন্তুষ্ট, আনন্দময়ী।

মা আর বাবা দুজনেই পরস্পরের প্রতি কী রকম সর্বাত্মক ভাবে নির্ভরশীল।

মা একদিন বাপের বাড়ি গিয়ে থাকতে পারেন না। বলেন সংসারের কাজের ভাবনায়, ওটা বাজে কথা। বাবাকে ছেড়ে একটা দিনও থাকতে পারেন না মা। বাবাও তাই। বাবার বন্ধু পরেশবাবু ছুটি হলেই একা এখান-সেখান বেড়াতে বেরিয়ে পড়েন, বাবাকে কতবার বলেছেন, বাবা যেতে চাননি।

ইলা জানে ওই একই কারণ।

ইলা জানত। কিন্তু এমন স্পষ্ট করে ভাবত কি কোনোদিন?

আজ মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন নতুন করে মনে পড়ল ইলার, মা চিরদিন সন্তুষ্ট আর সুখী। চিরদিন শান্তিময় জীবন মা-র।

তারপর উঠল প্রবল কম্পনোচ্ছ্বাস।

মা-র এই চিরশান্তির প্রাণে আগুন জ্বালল ইলা, চির সুখের প্রাণে বাজ হানল।

এর পর আর কোনোদিন অমন প্রসন্ন প্রশান্ত মুখখানি নিয়ে ছোটাছুটি করে সংসার করে বেড়াবেন না অমলা।

ইলা নামের এই মেয়েটার ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতার খবর পাবার পর মন ভেঙে যাবে তাঁর। ক্লিষ্ট হয়ে যাবেন, ক্লান্ত হয়ে যাবেন। পৃথিবীর প্রতি বিশ্বাস হারানো একটা কঠিন কঠোর মুখ নিয়ে সংসার করে যাবেন।

বাইরের লোকের সামনে মুখ দেখাতে পারবেন না অমলা আর অরবিন্দ। আত্মীয়দের কাছে পারবেন না কথা বলতে। মুখ লুকিয়ে বেড়াবেন। দেখা হলেই তো প্রশ্নে মুখর হয়ে উঠবে ওরা।

বলবে, 'হ্যাঁ গো, ইলা নাকি...?'

'হ্যাঁরে ইলা না কি?' যখন তখন এই শব্দটা ঘুরবে লোকের মুখে মুখে।

'রাশি রাশি মেয়েই তো এ রকম করছে আজকাল।'

নিজেকে বোঝাল ইলা, বহু বারের পর, আর একবার। বরং তাদের মা-বাপ পরে সুবিধে বুঝে একদিন আবার 'বিয়ে বিয়ে' নাটকটা অভিনয় করে।

গহনা-কাপড় দেয়, লোকজন খাওয়ায়। আলো জ্বালে, বাজনা বাজায়। চিঠি ছাপিয়ে নিমন্ত্রণ করে। কিন্তু—হ্যাঁ এই ভেবেই মনে বল পায় না ইলা, তারা হয়তো আস্তে আস্তে মনকে প্রস্তুত করে নেবার সময় পায়।

ইলার মা-বাপ পেলেন না।

এ-কথা তুলেছিল ইলা। আগে একদিন বলেছিল, 'ওঁরা প্রস্তুত হতে সময় পাবেন না।'

সম্বুদ্ধ বলেছিল, 'পেলেই দেবেন ভেবেছ? ঘোষের ছেলের হাতে কন্যা সম্প্রদান করবেন? তোমার বাবা? যিনি এখনও ধুতির ওপর কোট আর কোটের ওপর উড়ুনি চাপান।'

তা সত্যি, এ রকম সেকেলে সাজই করেন অরবিন্দ।

নীলা ইলা কত ঝগড়া করে, অরবিন্দ হাসেন। বলেন, 'এই পোশাকে কর্মজীবন শুরু করেছি, এই পোশাকেই শেষ করব সে-জীবন...তারপর দেখিস কি ফুলবাবুটি না সাজি। গিলেকরা পাঞ্জাবি, চুনটকরা ধুতি—'

মেয়েরা হেসে অধীর হয়।

'রিটায়ার করে সাজবে তুমি ওই রকম করে?'

'না সাজলে?' অরবিন্দ হাসেন, 'তোদের মেয়েদের পছন্দ হবে কেন আমাকে?'

হা-হা করে হাসেন আবার।

এই রকম সাদাসিধে পুরনো ধরনের মানুষ অরবিন্দ। ঠাট্টা-তামাশা কথাবার্তা সবই চিরকেলে। আধুনিকতার ছাপ পড়েনি সেখানে।—

কিন্তু অরবিন্দ কি কখনও কাউকে ঠকিয়েছেন? কারও মনে কষ্ট দিয়েছেন? কারও সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন?

করেননি।

ইলার বাবা নয়, মা নয়, দিদি-জামাইবাবু কেউ নয়। ওঁরা জানেন না খুব ভয়ানক একটা মিথ্যাচরণ করেও এমন হাসিমুখে ঘুরে বেড়ানো যায়।

ইলা জানে। ইলা এ-সব পারে। ইলা তাই করেছে।

আর এখন ইলাকে ততদিন ধরে তাই করতে হবে, যতদিন না সম্বুদ্ধর মাইশোরে যাবার ব্যবস্থা পাকা হয়।

আচ্ছা, আজ যদি ইলা সম্বুদ্ধর কাছে না যায়?

মেয়ে হয়ে রোজ রোজ যদি সে যেতে না পারে? ইলার তো একদিন জ্বর হতে পারে? অন্তত কোনোরকম শরীর খারাপ?

ভয়? কেন? কাকে? সম্বুদ্ধকে?

কেন ভয় করবে? সম্বুদ্ধ অভিমান করবে বলে?

করুক না একটু। দাম বুঝুক ইলার। রাগ করবে? করুক! রাগ করে বিয়ে ভেঙে দিতে পারবে? পারবে না। একখানি দলিলের বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেছে সম্বুদ্ধ।

বেশ একটা বুকের বল নিয়ে বাড়িতেই রয়ে গেল ইলা।

অথচ আগে পারত না। আগে পর পর দুদিন সম্বুদ্ধর সঙ্গে দেখা না করতে পারলেই ভয় পেত। মন হত, ও যদি বিরূপ হয়ে সরে যায়।

আজ আর তা মনে হল না।

বাড়িতেই রইল। বই পড়ত লাগল।

দিদি এল দুপুরে।

জামাইবাবু ছাড়া একা।

এ দৃশ্য প্রায় দুর্লভ।

এসে বলল, 'তোর জামাইবাবুর খিদমদগারি করতে করতে মলাম।..দে ফটোখানা। কেমন লাগল বল?'

ইলা বলল, 'খামোকা একটা ভদ্রলোকের ছবি ভালো লাগা না-লাগার প্রশ্ন কেন?'

'ন্যাকামি রাখ! বিয়ে করতে হবে না? তবু তো তোদের আমলে সব কত হয়েছে। আমরা তো সেই শুভদৃষ্টির আগে চক্ষেও দেখিনি লোকটা কানা না হাবা।'

'এখন তো চক্ষে হারা হচ্ছ রাতদিন।'

'থাম, খুব ফাজলামি হয়েছে। চললাম, লাগিয়ে দিতে বলি গে। মা তো একেবারে মূর্ছিত।...আর সত্যি কথা বলি, তোর একখানা ছবি ছিল আমার কাছে, সেটা দিয়েছিলাম ওদের কাছে, ওরাও বিগলিত। ঠিক এই রকমটিই নাকি চেয়েছিল তারা।'

ইলার মাথার মধ্যে যেন কারখানার রোল ওঠে। ইলার চোখের সামনের আলোটা ঝাপসা লাগে।...

ইলা কি বলে ফেলবে এই সুযোগে?

বলতে যায়। বলতে পারে না। বোকার মতো যা বলে, তা হচ্ছে এই—'এত তাড়াতাড়ি কি আছে?'

বলে ফেলে নিজেরই লজ্জা করে।

বুদ্ধি-সংবলিত একটা কথা বলতে পারল না ইলা। এই সুযোগে বলে ফেলতে পারল না।

দিদি বলল, 'কেন, বাইশ বছর বয়েসটা বুঝি বিয়ের বয়েস নয়? পেটে খিদে মুখে লজ্জার দরকার কিছু নেই। যাচ্ছি আমি। বলব গিয়ে তোর জামাইবাবুকে সারারাত ধরে তোমার শালী তোমার বন্ধুর ভাইপোকে দেখেছে। ছবিতে, স্বপ্নে।'

'আঃ দিদি! ভালো হবে না বলছি।'

দিদি ওর রাগ দেখে আরও ক্ষ্যাপায়, আরও ঠাট্টা করে, অবশেষে বিদায় নেয়।

অথচ আশ্চর্য, যেটা করতে এসেছিল সেটাই ভুলে চলে যায়। ছবিটা পড়েই থাকে।

তা পড়েই যদি থাকে, আর একবার উলটে নিয়ে দেখতে দোষ কি।

দিনের আলোয় তো দেখাই হয়নি।

কিন্তু কী হবে দিনের আলোয় দেখে? এ-প্রশ্ন করে না ইলা নিজেকে। ছবিটাই মুখস্থ করে।

আর সেটাকে ঘিরেই প্রশ্ন করে।

শুনলাম হিন্দুস্থান রোডে বাড়ি।

সে তো এই কাছেই। ওদের দোকান-বাজার মানেই গড়িয়াহাটের বাজার। যে-কোনো সময় আসতে পারে। আর ইলাও তো রাতদিন যায় ওখানে। দেখতে পেলে ঠিক চিনতে পারবে। আর ও? ওর আর পারতে হয় না।

সবাই কি ইলার মতো তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন?

ইলা একবার দেখলে ভোলে না।

হঠাৎ এক সময় মনে পড়ল ইলার, কাল থেকে ইলা সম্বুদ্ধকে একবারও ভাবেনি।

চোখের উপর হাত চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ল। ইলার বিবেক এখন ইলাকে তীক্ষ্ণ দাঁতে কামড়াবে।

সন্ধ্যার সময় কুমকুম এল। বলল, কী ব্যাপার? কাল থেকে একেবারে ডুব মারলি যে? আমি সম্বুদ্ধবাবু আর অসীম, তোর অপেক্ষায় বসে থেকে—হল কি? শুয়ে আছিস যে?

'শরীরটা ভালো নেই।'

'হুঁ, বিরহ জ্বর। তার দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। তোর মাকে বলে এলাম, কাল তোর আমাদের কাছে নেমন্তন্ন।...এমনিতে ভদ্রমহিলা এত সরল, কিন্তু তোর এই বাইরে যাবার ব্যাপারে যেন উকিল। কী জেরা বাবা! কেন, কী বৃত্তান্ত, উঃ বাবা!' চাপা হাসি হেসে গড়ায় কুমকুম।

'যাক ম্যানেজ করা গেছে এক রকম। বলেছি খাইয়ে-দাইয়ে নাইট শো'য়ে সিনেমা দেখিয়ে ফেরত দিয়ে যাব। তাও প্রশ্নবাণ কে-কে যাবে সিনেমায়, অত রাত্রে কে পৌঁছতে আসবে—'

অন্যদিন হলে কি ইলা ওই 'বাবাঃ' শব্দটার সঙ্গে নিজের অসহিষ্ণুতাও যোগ দিত না? বলত না কি, 'আর বলিস না ভাই, প্রায় নজরবন্দী আসামী। জীবন মহানিশা হয়ে গেল?' বলত। অন্যদিন হলে বলত।

আজ বলল না। আজ বরং ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠল, 'তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মা জানেন, মা-র কুমারী মেয়ে।'

কুমকুম অপ্রতিভ হয়ে বলে, 'তা বটে।' তারপর বলে, 'বলে রাগ করিস না, দৃষ্টিভঙ্গিটা বড়ো সেকেলে। আচ্ছা, তাহলে ওই কথাই রইল?'

কুমকুম চলে যায়।

আর এতক্ষণ পরে প্রথম সম্বুদ্ধর কথা মনে পড়ে।

সম্বুদ্ধ রাগ করেছে। ক্ষুব্ধ হয়েছে। কাল সব রাগ জল করে দিতে হবে। পুরুষমানুষের রাগ ক্ষণস্থায়ী।

ক্ষণস্থায়ী।

তবু রাগ দেখাতে ছাড়ল না সম্বুদ্ধ।

বলল, 'অবাক হয়ে গেলাম কাল! ভাবতেই পারিনি তুমি আসবে না। না আসা সম্ভব।'

ইলা গম্ভীরের ভান করে, 'আমিও অবাক হয়ে ভেবেছি, লোকটা এমনি আক্কেলহীন, একবার ভাবল না, খোঁজ নিই মানুষটা বাঁচল কি মরল।'

'না বাঁচার কি হল?'

'আহ্লাদেও হার্টফেল করতে পারি।'

'ঠাট্টা রাখ। এলে না কেন তাই বল?'

'মাথা ছিঁড়ে পড়ছিল।'

'হেতু? হঠাৎ কী ঘটল মাথায়?'

'ঘটল? কী ঘটল?' ইলা দুষ্টুমীর হাসি হেসে বলে, 'কাল তো প্রায় আমার পাকা দেখা ঠিক।'

'কী ঠিক?'

'পাকাদেখা, পাকাদেখা।'

'পাকাদেখা কি?'

'জান না? বিয়ের আগের নোটিস। ফিরে দেখি দিদি একেবারে পাত্রের ফটো নিয়ে এসে হাজির।'

মধুরাত্রির মিলন-মুহূর্তে এ-পরিহাস বিশেষ কৌতুক-মুহূর্ত সৃষ্টি করতে পারে না। সম্বুদ্ধর যেন রাগ ধরে যায়। চড়া গলায় বলে, 'খুব আপশোস হচ্ছে নিশ্চয়?'

'নিশ্চয়।'

'অবাক হয়ে যাচ্ছি।'

'অবাকের কি আছে?'

'মেয়ের বিয়ে খুঁজছেন এখন।'

ইলা ওর রাগে মজা পায়। বলে, 'তা, তাঁরা তো আর জানেন না ইতিমধ্যেই ঘটনাটা ঘটে গেছে।'

'এবার জানানো উচিত।'

'তাই ভাবছি। ও-সব লুকোচুরি অসহ্য লাগছে। চল না, বীরের বেশে গিয়ে দাবি জানিয়ে, রাজ-সমারোহে নিয়ে এস আমায়।'

নিয়ে এস, নিয়ে এস!

এই এক কথা ইলার।

বিয়ের আগে থেকে এই কথাই বলছে। কই, একবারও তো বলছে না, 'এস।'

বলছে না, 'এস, আমি তোমার জন্যে আদরের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছি, আমার আপনার লোকদের বুঝিয়ে!'

সম্বুদ্ধ তাহলে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে বাঁচত। তা নয়, তুমি সাহস করো, তুমি নিয়ে চল। তা না হলে আমায় থাকতে দাও আমার পুরনো কৌমার জীবনের মধ্যে।

এটা স্বার্থপরতা।

সম্বুদ্ধ ভুলে যায় বিয়ের আগে সম্বুদ্ধই বারণ করেছে। বলেছে 'বাধা আসবে। আমাদের কূলে-আসা তরী বিশবাঁও জলে গিয়ে পড়বে।'

ক্ষেত্র প্রস্তুত করবার তবে অবকাশ পেল কই ইলা?

অথচ এখন সম্বুদ্ধ অধীর হয়ে উঠছে। কাল বিয়ে হয়েছে, আজই ভাবতে শুরু করেছে ইলার চেষ্টা নেই। ইলা যেন শুধু বিয়ের দলিলে সই করেই ধন্য করেছে সম্বুদ্ধকে। সম্বুদ্ধও তবে সেই দলিলের জোর ফলাবে।

'আজ তোমার যাওয়া হবে না।'

'যাওয়া হবে না?'

'না, আজ এই 'নিরালা হোটেলে'র নিরালা ঘরেই স্থিতি।'

'বেশ। কাল তাহলে নিজে গিয়ে পরিচয়-পত্র দেখিয়ে পৌঁছে দিও।'

'ঠিক আছে, তাই দেব।'

'বাবা যদি বলেন, আমরা বাড়িতে তোমার স্ত্রীর জায়গা হবে না—আবার এইখানেই ফিরিয়ে আনবে?'

'উঃ!'

সম্বুদ্ধ হতাশ গলায় বলে, 'উঃ! আজকের দিনেও সেই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা? সেই টাকা-আনা-পাইয়ের হিসেব? কই, এতদিন তো মনে হয়নি তুমি রক্তমাংসের মানুষ নও, পাথরের?'

'এতদিন রক্ত-মাংসের খোঁজ করনি বলেই হয়তো টের পাওনি।'

'ঠিক আছে। তোমার বাবা যদি মেয়েকে তাড়িয়ে দেন—'

ইলা বলে, 'ভুল বলছ, বাবার মেয়েকে নয়, তোমার স্ত্রীকে।'

তর্কটা বাধা পেল।

কুমকুম আর অসীম এসে পড়ল হইচই করে। এল আর ক'জন বিবাহিত, অবিবাহিত বন্ধু। ফুল নিয়ে, উপহার নিয়ে। বিছানার ছড়িয়ে দিল গোলাপের পাঁপড়ি, ইলার খোঁপায় পরাল গোড়ে মালা। আরও দু'গাছা মালা রইল মজুত বদলের জন্যে।

সম্বুদ্ধর খরচে খেল সবাই।

তারপর বলল, 'গুড্‌বাই।'

কুমকুম চুপিচুপি বলে গেল, 'চলে যাব চলে যাব বলে পাগলামী করিস না। থেকে যা। সকালে আমার ওখানে যাবি, পৌঁছে দেব তোকে। আর রাত্রে যাহোক কিছু একটা খবর দিয়ে দেব তোদের বাড়িতে।'

ইলাও বলল, 'পাগলামী করিস না। নাইট শোয়ে সিনেমা দেখার টাইমটা হাতে আছে, ওই বেশ।'

'ওই বেশ?' সম্বুদ্ধ রেগে বলে, 'তুমি এমন ভাব করছ যেন সবটাই অবৈধ।'

'কি করব? মনের মধ্যে বৈধের সুর বাজছে না যে! বাড়ি ঢুকব কি করে সেইটাই মনের মধ্যে প্রধান হয়ে উঠছে।'

'বললাম তো কাল সকালে গিয়ে সব প্রকাশ করে ক্ষমা চেয়ে নেব।'

'বেশ!'

'বেশ।' সম্বুদ্ধ ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলে, 'এত হিসেব কসার পর আবেগ-ইচ্ছে, বাসনা-কামনা সব ডানা মেলে উড়ে যায়।'

বলে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার পরিচয় দেয় না। প্রবল বাসনার প্রচণ্ড আবেগে ইলাকে গুঁড়ো করে ফেলবার জেদ ধরেছে যেন।

ইলা মরে যাচ্ছে।

ইলা হারিয়ে যাচ্ছে।

ইলা তার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সব একাকার করে ফেলছে।

এখন যা করবে সম্বুদ্ধ। সব ভার তার, সব চিন্তা তার। ইলার নিজস্ব কোনো সত্ত্বাও বুঝি রইল না আর। নিজস্ব চিন্তাশক্তি।

কিন্তু সম্বুদ্ধই নতুন চিন্তায় এল।

'দেখ, এখন মনে হচ্ছে তোমার বুদ্ধিটাই ঠিক হয়েছিল।'

ইলা আস্তে বলল, 'কি?'

'মানে আর কি ফিরেই যাওয়া। এখনও সময় রয়েছে। পৌনে বারোটা বেজেছে। নাইট শো ভাঙছে।'

'আমি পারব না।'

'আহা, বুঝছ না—'

'আগে তো বুঝছিলাম, এখন বুঝতে চাই না।'

সম্বুদ্ধই তখন বোঝাতে চেষ্টা করে। কে বলতে পারে রাত কাবার করে সকালে ফিরতে দেখে ইলার বাবা পাড়া জানাজানি করে যাচ্ছেতাই করবেন কি না।...অপমানের শেষ থাকবে না তখন। বোঝাতে তো সময় লাগবে।

এখন এতরাত্রে নিশ্চয় তা করবেন না। আর তাড়িয়ে দিতেও পারবেন না।

এখনই ঠিক, এখনই সুবিধে।

'তার মানে তুমিই তাড়িয়ে দিচ্ছ?'

ক্লান্ত চোখ তুলে বলে ইলা।

সম্বুদ্ধ অবশ্য এ-প্রশ্নের উত্তর যথাযথ দেয়। তারপর বলে, 'যক্ষের অভিশাপে'র দিন ক'টা শেষ হতে দাও একবার।'

ইলা শিথিল গলায় বলে, 'মা ঠিক ধরে ফেলবেন।'

'কেন? না না, অকারণ ভয় পাচ্ছ। গাড়ির মধ্যে কে আছে না আছে এত রাত্রে কে দেখেছে? তুমি একটু গলা তুলে বলবে, 'কুমকুম, তোর আর এত রাতে নামবার দরকার নেই, বাড়ি চলে যা।'

ইলা ঝেঁজে ওঠে।

'মানে, তোমার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার খেসারত দিতে অবিরত অভিনয় করে চলি?'

সম্বুদ্ধ বলে, 'লাঠি না ভেঙে যদি সাপটা মারা যায়—'

'অথচ খানিক আগে লাঠিটাই ভাঙছিলে—'

সম্বুদ্ধ একটু করুণ করুণ গলায় বলে, 'আমি তোমার মতো পাথরের দেবতা নই ইলা।'

এইভাবেই ইলার ফুলশয্যার শয্যা থেকে বিদায়-গ্রহণ।

বাড়ি ফেরার সময় যথারীতি অভিনয়টা করতে হল। 'কুমকুম আর কুমকুমের দাদা গাড়িতে আছে, নামিয়ে দিয়ে গেল ইলাকে।' ইলার সর্বাঙ্গে ফুলের গন্ধ জড়ানো, ইলার সর্বদেহে বিবশ শিথিলতা।

ইলা কি ওই অভিনয়টুকু করেই পার পেয়ে যাবে? দরজা খোলার মুহূর্তে প্রস্তুত হয়ে থাকে ইলা

ঝড়ের মুখে পড়বার জন্যে নিশ্চয় এবার দরজা খুলবেন, আর তীব্র ভর্ৎসনা করবেন প্রশ্ন করবেন কোন্ হলে ছবি দেখতে গিয়েছিল তারা। ইলা এই সৌরভে-আকুল দেহটা নিয়ে দাঁড়িয়ে কি উত্তর দেবে বাবাকে?

যদি তেমন অপমানের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় ফিরে আসবে ইলা, এই ঠিক করা ছিল?

গাড়িটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে সম্বুদ্ধ রাস্তার এ-ধারে।

নিয়ে চলে যাবে ইলাকে।

পরদিন সম্বুদ্ধ দেখিয়ে যাবে দলিল। শুনিয়ে যাবে দু'কথা।

মানে সেটা সম্বুদ্ধর মত।

এ-সবই 'যদি'র উপর ছিল।

কিন্তু দরজা খুলে দিলেন মা।

আর ইলা ঢুকতেই বলে উঠলেন, 'বন্ধুর বুঝি জন্মদিন ছিল? কই, কিছু তো নিয়ে গেলি না?'

ইলা আস্তে বলে, 'জন্মদিন নয়।'

'তবে? শুধু শুধুই? বড়োলোকদের যা সাধ হয় মেটাতে পারে। খোঁপার মালাটা কুমকুমই দিয়েছে বুঝি? কী চমৎকার গন্ধ! ঢুকলি যেন একটা বিয়ে-বাড়ি নিয়ে এলি সঙ্গে করে।'

ইলা চমকে তাকাল।

না, অমলার মুখে কোনো অভিসন্ধির ছাপ নেই। সেই তাঁর সবেতেই খুশিভাব নিয়েই কথা বলছেন, 'আস্তে আস্তে চল। এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছেন উনি। বারবার দেখছিলেন, আমিই বকে বকে ঘুমোতে পাঠালাম। বলি যে, তোমার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে কি সিনেমা এগারোটার আগেই ভেঙে যাবে?...ভাগ্যিস ঘুমিয়ে পড়েছেন! রাতও কিন্তু তোদের বড্ড হল। খুব বড়ো বই বুঝি?'

এরপরও কি ইলার ভিতরের আবেগ চোখের কিনারায় ফেটে পড়তে চাইবে না?

এই মা।

স্বপ্নেও ধারণা করতে পারবেন না কতবড়ো ঠগ-জোচ্চোর তাঁর ছোটো মেয়ে।

কী নির্মল স্নিগ্ধ সরল বিশ্বাস!

ইলা যা বলেছে, তাছাড়া যে আর কিছু করবে, একথা অমলা ভাবতে পারছেন না।

কুমকুম বলেছিল জেরা।

জেরা নয়, ছেলেমানুষের মতো কৌতূহল আছে মা-র। জিজ্ঞেস করে করে সেই কৌতূহল মেটান। নইলে এই এত রাত্রে বলেন, 'তারপর? বল শুনি কী কী খেলি বন্ধুর বাড়িতে?'

ইলা এই সরল বিশ্বাসের কাছে হার মানে। ইলা বলে উঠতে পারে না, 'মা, তুমি যা ভাবছ তা সব ভুল। আমি যা বলেছি, তা সবই মিথ্যে। আমি প্রতারণা করে চলেছি তোমার সঙ্গে।'

ইলা ঝুপ করে বিছানায় শুয়ে পড়ে বলে, 'কাল শুনো সব, ভীষণ ঘুম পেয়েছে।'

শুয়ে পড়ে। তার এতদিনের একক শয্যায়। নির্মল, সুন্দর, পবিত্র।

কিন্তু ঘুম কি আসে অমলার 'ভীষণ-ঘুম-পাওয়া' মেয়ের?

একদিকে মায়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার যন্ত্রণা, আর একদিকে এক নতুন মাদকতার স্বাদ পাওয়া রোমাঞ্চিত দেহ-মনের অতৃপ্ত ক্ষুধার যন্ত্রণা, যেন দীর্ণ-বিদীর্ণ করতে থাকে ইলাকে।

তীব্র ক্ষুব্ধ অভিমানে সম্বুদ্ধর উপর বিদ্রোহী হয়ে ওঠে সেই অতৃপ্ত মন।

সাময়িক বাসনার প্রয়োজন মিটিয়ে সম্বুদ্ধ তাকে বিদায় দিয়েছে, ঠেলে দিয়েছে আশঙ্কার মুখে, অপমানের মুখে।

হয়তো এমনিই করতে থাকবে সে, করতে চাইবে। সমস্ত দুঃখময় পরিণামের দিকে ইলাকে ঠেলে দিয়ে নিজের দাবি জানাবে। বৈধ স্বামীর দাবি।

হ্যাঁ, এই জন্যে সম্বুদ্ধ 'বিয়ে বিয়ে' করে অধীর হয়ে উঠেছিল, দাবিটাকে বৈধ করে নেবার জন্যে।

নির্ঘাত এরপর সম্বুদ্ধ যখন-তখন এই গোপান অভিসারের স্বাদ চাইবে।

চাইবেই। সেই লোভ আর লোলুপতার ছাপ দেখেছে ইলা তার স্বামীর চোখের দৃষ্টিতে।

স্বামী।

ইলার স্বামী।

যে-স্বামী রাত দুপুরে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে যায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে।

যন্ত্রণাপীড়িত ইলার ঘুম আসে প্রায় শেষরাত্রে। ঘুমিয়ে থাকে বেলা অবধি।

অমলা মায়া করে ঘুম ভাঙান না।

হ্যাঁ মায়াই। অমনিই মায়া অমলার। নেমন্তন্ন খেয়ে আর সিনেমা দেখে রাত করে ফিরেছে মেয়ে, তবু অমলার ঘুম ভাঙাতে মায়া হয়েছে।

হঠাৎ ঘুম ভাঙে দিদির গলার শব্দে।

দিদি সকালবেলা!

ওঃ, আজ রবিবার, সকালবেলা আসে দিদি। কিন্তু এত সকালে? ক'টা বেজেছে?

ঘরের জানলা-দরজা ভেজানো, আকাশের আলোর চেহারা ধরা যাচ্ছে না, ঘাড় ফিরিয়ে দেওয়ালে ঝোলানো ঘড়িটা দেখল। চমকে উঠল।

ন'টা বাজে।

চমকে উঠল, কিন্তু উঠে পড়ল না। অলস কান পেতে শুয়ে রইল।

আর সেই কানে এসে ঢুকতে লাগল, 'যাই বল মা, এবার কিন্তু তোমার মেয়ের ওপর একটু রাশ টানা উচিত। হোক বন্ধুর বাড়ি, তাহলেও, রাত বারোটায় বাড়ি ফিরবে—'

অমলার গলা শোনা যায়, 'আহা, খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই মিলে আমোদ করে সিনেমা যাবে বলে গিয়েছিল তো।'

দিদির প্রখর গলা মুখর হয়ে উঠছে, 'তা বেশ, যা করেছে করেছে, আর অত স্বাধীনতা দিও না বাপু যতই হোক মেয়ে। কখন কার সঙ্গে কি ঘটিয়ে বসবে কে জানে।'

অমলার হাসি শুনতে পাচ্ছে ইলা।

অমলা বলছেন, 'আমরা মেয়ে অমন নয়। তোকে কি আমি কম স্বাধীনতা দিয়েছিলাম? তুই ঘটিয়েছিলি কিছু?'

দিদির গলা একটু খাদে নেমেছে, তবে নীলার খাদের গলাও পাশের বাড়ি থেকে শোনা যায়, এই যা। নীলা বলছে, 'আহা, সে তো আরও পাঁচ-সাত বছর আগে গো। যত দিন যাচ্ছে, তত বুকের পাটা বাড়ছে ছেলেমেয়েদের। তোমার জামাই বলছিল, কে নাকি বলেছে ওকে, একটা ফরসা মতন ছেলের সঙ্গে মাঝে মাঝে মুকুল কেবিন না কোথায় চা খেতে দেখেছে।'

আবার অমলার হাসি শোনা যায়, 'সে তো বাপু রাতদিনই দেখা যায়, সবাইয়ের ঘরে ঘরেই। মেয়ে বলে কি আর কিছু আটক বাঁধন আছে আজকাল? মেয়ে ছেলে সমান হয়ে উঠেছে।'

নীলা বলে ওঠে, 'সমান হয়ে উঠেছে বলেই তো সমান নয় মা! বিধাতাপুরুষ যে জব্দ করে রেখেছে। তার ওপর কলম চালিয়ে জিতে গিয়ে কত মেয়ে কত মরণ-বাঁচন কাণ্ড ঘটাচ্ছে, কত বিপদ ঘটাচ্ছে, খবর রাখ না তো।'

এবার আর অমলার হাসি শোনা গেল না।

অমলা গম্ভীর হয়েছেন।

বলছেন, 'তা কি করব বল? সেকালের মতো যখন ঘরে পুরে রাখা চলছে না, তখন ওদের

বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর ছেড়ে দিতে হবে, ওদের সততার ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। ছেলেমেয়েকে রাতদিন সন্দেহ করতে হলে মানুষ বাঁচবে কি করে?'

ইলা কি মরে যাবে?

এই বিছানায় শুয়ে শুয়ে?

ইলার ঘরে কোনো বিষ নেই? ঘুমের ওষুধ? মালিশের ওষুধ?

সেকালে নাকি রাজপুতের মেয়েরা 'বিষপাথরে'র আংটি হাতে রাখত, হঠাৎ ভয়ানক কোনো লজ্জা-অপমানের মুখোমুখি হয়ে পড়লে সেই আংটি চুষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত।

(এই রকম সব পড়েছে ইলা।)

তেমন আংটি কেন একটা নেই ইলার?

ইলার তাহলে আর মাকে মুখ দেখাতে হয় না।

না, ইলাকে কোনো মৃত্যুই বাঁচাতে পারল না।

ইলাকে অতএব সদ্য-ঘুম-ভাঙার ভূমিকা নিয়ে মঞ্চে এসে দাঁড়াতে হল।

বলতে হল, 'উঃ, কী সাংঘাতিক ঘুমিয়েছি বাবাঃ! মা, ডেকে দাওনি কেন? দিদি কতক্ষণ? জামাইবাবু আসেননি?'

অনেকগুলো কথা বলা ভালো।

অনেকগুলো কথার জালের মধ্যে মুখের চেহারাটা গোপন করা যায়।

নীলা বলে ওঠে, 'আর জামাইবাবু! জামাইবাবুর এখন শালীদায় দশা। গেছে সেই সেখানে, পাত্রের বাবার কাছে, কবে কনে দেখতে আসবে জানতে। জানে তো বাবা ভালোমানুষ, তেমন বলতে কইতে পারেন না।'

না, বাঁধ না দেওয়াটা পাগলামী।

ইলা হাই তুলে বলে ওঠে, 'তোমাদের মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? ওসব এখন হবে-টবে না, ছাড়।'

নীলা অবশ্য এটাকে কপট বৈরাগ্যই ভাবে।

কারণ পাত্রর ফটো যে তার ছোটো বোনটিকে 'মেরে' রেখে দিয়েছে; এ তো নিশ্চিত কথা।

তাই ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে নীলা, 'ন্যাকামী রাখ, বিয়ের যেন বয়স হয়নি বাছার, তাই আমাদের মাথা খারাপ দেখছেন। কেন, ফটোটা অপছন্দ হয়েছে?'

ইলা ঠোঁট উলটে বলে, 'ফটো আমি দেখিইনি।'

নীলা আর একবার ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'ওঃ, তাই তো, ফটোটা দেখেইনি! আর দর বাড়াতে হবে না, ঢের হয়েছে। কাল ওরা আসতে পারে—'

'দিদি, ভালো হবে না বলছি। রিসার্চটা শেষ না হলে—'

নীলা গম্ভীর হয়।

বলে, 'তোদের জামাইবাবু কি একটা নিরক্ষরের ঘরে সম্বন্ধ করছে তোর? তাই বিয়ে হলেই রিসার্চ বন্ধ হয়ে যাবে তোর? শিক্ষিত পরিবার, তাদেব মেয়েরাও এম-এ বি-এ পাস! ছেলের এক বোনও তো ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। খুব শিক্ষিত পরিবার।'

শিক্ষিত পরিবার।

তাদের মেয়েরাও সব এম-এ বি-এ পাস।

ইলার চোখের সামনে সম্বুদ্ধর বিদ্বেষ-বিদ্দিষ্ট মুখটা ভেসে ওঠে, 'আমাদের বাড়ির কথা আর তুলো না। অর্ধশতাব্দী পূর্বের মনোভাব নিয়ে কাল কাটাচ্ছেন তাঁরা দু-চোখে ঠুলি এঁটে।'

ইলার কণ্ঠে অবশ্য নীরবতা।

নীলা আবারও বলে, 'ওরা বিয়ের জন্যে ব্যস্ত। কারণ ছেলে আবার মাস আষ্টেক পরে আমেরিকায় চলে যাবে। অবিশ্যি বউ নিয়েই যাবে। মা-বাপের ইচ্ছে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে নিয়ে, এই ক'টা মাস সাধ-আহ্লাদ করা। এমন সম্বন্ধ আর জুটবে চট করে?'

ইলাকে কষ্ট করে হাসতে হয়।

আর সেই কষ্ট হাসির সঙ্গে বলতে হয়, 'তোমার যা উৎসাহ দেখছি দিদি, মনে হচ্ছে তোমার বিয়েটা হয়ে গেছে বলে আপশোস হচ্ছে।'

'মা শুনছ! শুনছ তোমার ছোটোমেয়ের কথা?'

নীলা বকছে, হাসছে, 'একটা কড়া বর, আর জাঁদরেল শাশুড়ি হচ্ছে তোর উপযুক্ত।'

দিদি এলেই বাড়িটা সরগরম হয়। হাওয়ায় আনন্দ ভাসে।

কারণ দিদি সুখী।

কিন্তু দিদি ভীষণ জেদীও। এই বিয়ে নিয়ে যখন লেগেছে, উঠে পড়ে চেষ্টা করবে। গোড়াতেই তবে মূলোচ্ছেদ করা উচিত।

কিন্তু কখন? কোন্ অবসরে?

কিভাবে পাড়বে কথাটা? ঝপ করে? বিনা ভূমিকায়? বলবে 'বিয়ে বিয়ে করে অস্থির হয়ো না দিদি, সে-কাজটা আমি তোমাদের জন্যে রেখে দিইনি।'

নাঃ! হচ্ছে না।

তবে কি ভূমিকা করে?

'দিদি, একটা কাণ্ড হয়ে গেছে। মাকে তো বলতে সাহস হচ্ছে না, তোমাকেই বলি—'

বলল।

কিন্তু তারপর? দিদির আর জামাইবাবুর ঘৃণার চোখ থেকে কোথায় সরে যাবে ইলা। মা-বাবার সামনে কি করে মুখ তুলে দাঁড়াবে? ছোটো ভাই রমুটা পর্যন্ত হয়তো ঘৃণার দৃষ্টিতে চাইবে ছোড়দির দিকে।

ইলা যদি প্রেমে পড়ে গিয়ে ব্যক্ত করত সেই 'পড়ে যাওয়ার' খবর, ইলার জন্যে বিরক্তি জমে উঠতে পারত, কিন্তু ঘৃণা নিশ্চয় নয়। ইলা তা করেনি। ইলা নিজের জন্যে সঞ্চয় করেছে ঘৃণা, করেছে তাদের কাছ থেকে, যারা ইলাকে প্রাণতুল্য ভালোবাসে।

একটু পরেই ইলার বাবা এলেন বাজার করে।

রবিবারের বিশেষ বাজার।

রবিবারে দুপুরের খাওয়াটা এখানেই খায় দিদি-জামাইবাবু। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা ওর আর নড়চড় নেই।

ইলার বাবা ভোরবেলা বাজারে চলে যান, বেছে দেখে পছন্দ করে কিনে নিয়ে আসেন মাছ-তরকারি মেয়ে যা ভালোবাসে, জামাই যা ভালোবাসে।

এত স্নেহ নীলা-ইলার বাবার।

এতদিন এমন স্পষ্ট করে অনুভবে আসেনি ইলার। ওই শান্ত স্বল্পভাষী মানুষটার মধ্যে কী অগাধ স্নেহসমুদ্র! খুব একটা অবস্থাপন্ন অবস্থা নয় বাবার, তবু সন্তানদের কোনোদিন বুঝতে দেননি সে-কথা। নীলা ইলা রমু যখন যা প্রয়োজন সব পেয়েছে। বিশেষ করে ইলা।

দিদির তো আই-এ পড়তে পড়তে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, তবু তত খরচের দায় ছিল না।

ইলার জন্যে বাবা কত খরচ করে চলেছেন। এম-এ পড়ল, রিসার্চ করছে, একদিনের জন্যে বাবার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হতে শোনেনি ইলা 'আর পারা যাচ্ছে না।'

অথচ ইলার বরাবরের সহপাঠিনী দীপা?

বাবা তার কত বড়োলোক, তার পোশাক-পরিচ্ছদ আর টিফিন দেখে তাক লেগে যেত এদের।

কিন্তু বইখাতা কিনতে হলেই নাকি তার মা-বাপ খেপে উঠতেন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির নামে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি করতেন, এবং অন্য মেয়েদের কাছ থেকে পুরানো বই কিনতে পাওয়া যাবে কি না তার সন্ধান নিতে বলতেন মেয়েকে।

ইলার বাবা চিরদিন মাসকাবার হলেই নিজে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, 'ইলুবাবু, তোমার কি কি চাই?'

বাবার ইলুবাবু তার প্রতিদান দিল বাবাকে।

বাবাকে দেখে মন কেমনের বাষ্পে বুকটা উথলে ওঠে ইলার।

আর হঠাৎ আজই প্রথম এমন স্পষ্ট করে মনে হল, এই সমস্ত কিছুর বদলে আমি কী পেলাম? এই অগাধ স্নেহ-সমুদ্র, এই ভালোবাসায়-ভরা মাতৃহৃদয়। এই আমার চিরদিনের পরিবেশ, আর—আমার চিরদিনের সুনাম, এতগুলোর বিনিময়ে?

প্রেম?

এই সমস্ত কিছুর পূরণ হবে সেই প্রেমে? সম্বুদ্ধর আছে তেমনি প্রেম? প্রেমের শক্তি?

আর কিছুক্ষণ পরে হেমন্ত এল।

বলল, 'ইলা, ভাগো। তোমরা উপস্থিতি এখানে নিষ্প্রয়োজন।'

ইলা বলল, 'নিষ্প্রয়োজন কাজই তো সর্বদা করে থাকি আমরা জামাইবাবু!'

'তবে শোন বিয়ের গল্প। কান পেতে শোন।...বুঝলেন মা, ইলার ছবি দেখেই ওদের মতো হয়ে গেছে, বলছিল, আর কি দরকার নিয়মমাফিক কনে দেখায়? আমিই বললাম, তা হোক, ও কোনো কাজের কথা নয়, চোখে দেখে যান একবার।...ছেলেকেও নিয়ে আসুন, দু-পক্ষেরই চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন হয়ে যাক।'

ছেলে।

মানে, সেই ছবির মানুষটা।

না না, এভাবে ইলা ঘটনার স্রোতে ভেসে যেতে পারবে না।

ইলা জামাইবাবুকে বলবে।

বলবে সকলের আড়ালে। এই একটা জায়গাই তবু সহজ মনে হচ্ছে। যাক, এখন সকলের সামনেও তো সম্মতি লক্ষণের লক্ষণ দেখানো যায় না। তাই বকে উঠে বলে, 'ধন্যবাদ জামাইবাবু, আপনাদের রুচিকে ধন্যবাদ। এখনও ওই পচা-পুরনো ঘৃণ্য প্রথাটাকে কি করে যে বরদাস্ত করেন আপনারা! ছিঃ!'

হেমন্ত অবশ্য এই 'ছিঃ'তে বিচলিত হয় না। হেসেই ওঠে বরং। বলে, 'এখনও যখন সেই পচা-পুরনো ঘৃণ্য প্রথায় দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খাই, সেই পচা-পুরনো সেকেলে প্রথায় বালিশে মাথা রেখে ঘুমোই, বরদাস্ত করতে বাধে না, তখন এ-সব ছোটোখাটো ব্যাপারগুলোকে বড়ো করে দেখে লাভ কি?...বিয়ে হেন ব্যাপার, নিজের চোখে একবার দেখে নেবে, এটা কি খুব অস্বাভাবিক?'

'একবার চোখে দেখলেই সব বুঝে ফেলা যায়?'

হেমন্ত একবার নীলার দিকে কটাক্ষপাত করে, 'জীবনভোর দেখলেই কি বুঝে ফেলা যায়? বোঝাবুঝিটা তুলে রাখতে হয় বিবাহ-পরবর্তী কালের জন্য। বোঝাবুঝি সারাজীবন।...তুমি যদি কারও সঙ্গে প্রেম করে দু-চার বছর কাল পূর্বরাগ চালিয়ে যাও বুঝতে পারবে তাকে?'

ইলা কেঁপে ওঠে।

একি সাধারণ তর্ক-যুক্তির কথা? না, কোনো উদ্দেশ্যমূলক কথা? জামাইবাবু কি সব জেনে

ফেলেছেন? কিন্তু তাই কি? তাহলে জামাইবাবু তাঁর বন্ধুর ভাইপোর সঙ্গে এ-সব কথা চালাচ্ছেন কেন?

নাঃ, সাধারণ তর্কেরই কথা।

ওই যে বলেই চলেছেন জামাইবাবু ইলার দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি না ফেলেই।

বলছেন, 'পারা যায় না। যতক্ষণ না তুমি তার স্বার্থের সঙ্গে মুখোমুখি হচ্ছ, তার আটপৌরে জীবনের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছ, পাঁচ বছর মেলামেশা করলেও বুঝতে পারবে না তাকে। অতএব ও তোমার গিয়ে শীতকালে ঠাণ্ডা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো একবার চোখ-কান বুজে ঝাঁপিয়ে পড়াই ভালো।'

ইলা ঈষৎ শ্লেষের সুরে বলে, 'তারপর ''ভাগ্য'', কি বলুন?'

এই স্বভাব ইলার, শ্লেষাত্মক বচনে মনোভাব প্রকাশ। বিশেষ করে জামাইবাবুর সঙ্গে।

ঝগড়া। কেবল ঝগড়া চলে।

জামাইবাবুর সঙ্গে ঝগড়া না করলে দিনটাই বৃথা যায় ইলার।

কিন্তু কিছুদিন থেকে নিজেই কেমন ভিতরে ভিতরে অপ্রতিভ হয়ে গেছে ইলা। ঝগড়া জমাতে পারে না।

প্রেমে পড়ে বুঝি কথার তীক্ষ্নতাও হারিয়ে ফেলেছে সে।

প্রেমে পড়েও ততটা নয়, ওই রেজিস্ট্রির ব্যাপার ঠিক হয়ে গিয়ে পর্যন্ত। অথচ ইলার জানাশুনো বেশ দু-চার জন মেয়ে এমন ঘটনা ঘটিয়ে অবলীলায় হাসছে খেলছে বেড়াচ্ছে। আসল কথা উপাদান।

সকলের উপাদানে সব কিছু খাটে না। ছেলেবেলায় ইলা একবার বাবাকে লুকিয়ে কুলপি বরফ খেয়েছিল। খাবার পর থেকেই উথলে উথলে কান্না উঠেছিল ইলার বুক থেকে, মাথার ভিতর থেকে, বাবা বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই হাউ-হাউ কেঁদে বলে ফেলেছিল ইলা বাবাকে, 'বাবা, আমি কুলপি বরফ খেয়েছি।'

সেই উপাদান।

তবু এখন জোর করে পুরনো সহজ কৌতুকের অভ্যাসকে ফিরিয়ে আনে। বলে, 'তারপর ভাগ্য, কি বলুন?'

হেমন্তও জোর দিয়ে বলে, 'নিশ্চয়? তারপর ভাগ্য, আবার কি? তবে হ্যাঁ, যারা তোমার হিতৈষী, যারা তোমার প্রিয়জন, তাদের শুভেচ্ছার ওপর একটু আস্থা রেখ।'

'জামাইবাবু আজ রেখেছেন।'

'পাগল, রাগ কিসের!' হেমন্ত হাসে, 'তুমি অবশ্য ভেবেছিলে রাগিয়ে দিয়ে কাজ পণ্ড করে দেবে—সেটি হবে না।'

হল না পণ্ড।

আরও বহুবিধ কথার পরও সেই কথাই স্থির রইল। কাল কনে দেখবে ওরা।

তবে কি আর সেই ঘাড় গুঁজে বসে, ভয়ে ভয়ে বরপক্ষের বিটকেল বিটকেল সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া? না, অতটা নয়। ভদ্রলোক বেড়াতে আসার মতো আসবে, ইলা বাড়ির মেয়ে হিসেবে, স্বচ্ছন্দ গতিতে চা-খাবার এগিয়ে দেবে, এই পর্যন্ত।

ইলার আপত্তি? মানছে কে?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত খুব একটা আপত্তিই কি করল ইলা?

না ইলা ভাবল যাক গে এটুকু একবার দেখাই যাক! হাজার লোকের সামনে বেরোচ্ছি, দু-একটা লোক এলই বা বাড়িতে। বেরোলাম বা তাদের সামনে। ক্ষয়ে যাব না তো।

বরং সম্বুদ্ধকে খেপাবার একটা বিষয়-বস্তু পাওয়া যাবে।

নিজে থেকে আর যাব না ওর কাছে—এ সঙ্কল্প করেছিল ভুলে গেল। ভাবতে লাগল হোক কালকের মজাটা, তারপর আচ্ছা করে রাগানো যাবে।

এতক্ষণ পরে মন কেমন করল সম্বুদ্ধর জন্যে। বেচারা!

ওর কি কাল কম কষ্ট হয়েছে? নেহাত অসুবিধেয় আছে তাই।

দাদারা আছে সম্বুদ্ধর, এবং বড়দার প্রকাণ্ড একটি আইবুড়ো মেয়ে আছে। সেইটির জন্যেই আরও জ্বালা। অতবড়ো ভাইঝি পড়ে থাকতে নিজে বিয়ে করল সম্বুদ্ধ, এত স্বার্থপরতা নাকি কেউ ক্ষমা করবে না।

অথচ নিজেরাও কিছু কম স্বার্থপরতা দেখাচ্ছেন না।

তারপর ইলা স্পন্দিত হতে লাগল, এক নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবার আশায়। আবার হাসলও মনে মনে।

যাক, কিছুই তো হয়নি আমার। কোনো পরিচিত অনুষ্ঠান। এ-একটা হয়ে যাবে তবু। কনে দেখা।

কুমকুম বিবেকের দংশনে দগ্ধাচ্ছিল।

বেচারী ইলা!

সারারাত বাইরে কাটিয়ে সকালবেলা বাড়ি ফিরে না জানি কী অভ্যর্থনা জুটেছিল তার ভাগ্যে। সম্বুদ্ধ কি সঙ্গে গিয়ে লুকোচুরির পালাটা সাঙ্গ করে ফেলেছে?

নাকি ইলার মা-বাবা এই অনিয়মের মূর্তি দেখে শাসনে আগুন হয়ে উঠেছিল। গিয়ে খবর নেবার সাহস হল না অথচ। তার চেয়ে সম্বুদ্ধর বাসায় যাওয়া সোজা।

সেদিনই পারল না। পরদিন সন্ধ্যায় গেল।

আর সম্বুদ্ধর মুখে প্রকৃত ঘটনা শুনে গালে হাত দিল।

'রাতেই ফিরিয়ে দিয়ে এলে তুমি তাকে? বলিহারী! এত কাণ্ড, এত ইয়ে করবার দরকার কি ছিল তাহলে?'

সম্বুদ্ধ লজ্জা পেল।

নিজের মান বাঁচাতে অনৃতভাষণের আশ্রয় নিল। বলল, 'আর বল না। যা অস্থিরতা করছিল। আশ্চর্য ভয়।'

'তুমি একটা কাওয়ার্ড।' অসীম বলে ওঠে, 'আমি বলব, তোমার এখন বিয়ে করা উচিত হয়নি। নিজেরই যখন দাঁড়াবার জায়গা নেই।'

সম্বুদ্ধ বলে, 'ভালো লাগছিল না। না করে স্বস্তি পাচ্ছিলাম না।'

'এখন খুব স্বস্তি পাবে? আকণ্ঠ পিপাসা, সামনে অগাধ সমুদ্র, কিন্তু লবণাক্ত।'

'করা যাচ্ছে কি! ইলা যে একবারে মা-বাপের ভয়ে—'

'তুমিও দাদা-বউদিদের ভয়ে—'

'সেটা ভয় নয়, বিতৃষ্ণা।'

'ফলাফল একই। ক্রমশ ইলারও তোমার প্রতি বিতৃষ্ণা আসবে দেখ।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ, মেয়েরা কাপুরুষ পুরুষকে ভালোবাসতে পারে না। বরং বর্বরকে ভালোবাসবে, অসভ্যকে ভালোবাসবে, তবু তোমার মতো কাপুরুষকে নয়। যাক, তুমি কলকাতা থেকে বিদায় হচ্ছ কবে?'

'ওই তো, ওইখানেই তো মুশকিল। অফিস তো ছাড়তে চাইছে না।'

'তুমি ছাড়বে।'

'বলছে মোটা ইনক্রিমেন্ট দেবে।'

'কেন, লোক আর জুটছে না তাদের?'

'দেখছি তো তাই।'

অসীম বিরক্ত ভাবে বলে, 'কিন্তু এখান থেকে বিদেয় না হলে বউকে তো তুমি নিয়ে যেতে পারছ না?'

'সেই তো চিন্তা।'

কুমকুম বলতে যাচ্ছিল, 'চিন্তাটা কিছু আগে হলে হত না? এখন—'

বলা হল না।

ইলা এসে হাজির হল।

ইলার মুখে-চোখে প্রসাধনের আভাস। আর মুখের চেহারা কৌতুকের।

কুমকুম হই হই করে ওঠে, 'যাক, বেঁচে আছিস তাহলে? উঃ আমি তো ভাবলাম—'

'কি ভাবলি?'

'না, মানে ভাবিনি কিছু। কি ভাবা উচিত ছিল তাই ভাবছিলাম।'

'চমৎকার! তা, এতক্ষণ কিসের মজলিশ হচ্ছিল?'

'তোর নিন্দের। তুই যা লোমহর্ষণ কাণ্ড করেছিস পরশু—'

'পরশু?' ইলা বলে, 'পরশু আমি কিছু লোমহর্ষণ কাণ্ড করিনি। তবে হ্যাঁ, আজ একটা করে এলাম বলে বটে।' মিটিমিটি হাসতে থাকে ইলা।

জ্বালাবে। খুব জ্বালাবে ইলা সম্বুদ্ধকে। শোধ নেবে সে-রাত্রের।

অসীম বলে, 'ব্যাপারটা কি? ঘটনাটা প্রকাশ করে এলে?'

'উঁহু। সম্পূর্ণ উলটো। কনে দেখা দিয়ে এলাম।'

'কি? কি দিয়ে এলে?'

সম্বুদ্ধ বলে ওঠে।

ইলা হেসে হেসে বলে, 'কনে দেখা দিয়ে এলাম। বাবার কনিষ্ঠা কন্যার বিয়ের জন্যে বাবা অবশ্যই ভাবিত হচ্ছেন, এবং বাবার জ্যেষ্ঠা কন্যা অবশ্যই তাতে সাহায্য করবেন। যোগ ফল এই। পাত্র আর পাত্রের বাবা দুজনে এসে দেখে গেলেন। আমিও গুড গার্লের মতো তাঁদের চা দিলাম, খাবার দিলাম, দু-চারটে প্রশ্নেরও যে উত্তর দিলাম না তা নয়। তাঁরা তো একেবারে বিগলিত! বাসায় ফিরে না মরে থাকে।'

কুমকুম রুদ্ধকণ্ঠে বলে, 'ঠাট্টা করছিস না সত্যি বলছিস?'

'বাঃ, খামোকা এমন অদ্ভুত ঠাট্টা পাবই বা কোথায়?'

'এসবের বিপদটা বুঝছিস না? এরপর আর এগোতে গেলে—'

'তা, আর এগোনো চলবে না সেটাই বলতে এলাম। এখন ও বলুক কি করবে?'

সম্বুদ্ধ এতক্ষণ সিগারেট ধ্বংসাচ্ছিল, আর বোধ করি ভিতরে ভিতরে নিজেও ধ্বংস হচ্ছিল। এবার ব্যঙ্গ তিক্তকণ্ঠে বলে, 'আমাকে কি করতে বলা হচ্ছে? দাবি ছেড়ে দিতে?'

'থাম্ বুদ্ধু!' অসীম বলে, 'ওর অবস্থাটা বুঝছিস না? বাড়িতে যদিও কিছু না বলে, বা বলতে না পায়, স্বভাবতই এ পরিস্থিতিতে পড়তে হবে। কেলেঙ্কারি আরও কতদূর গড়াবে তাও বোঝ! যা এইবেলা তুই ওর বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলগে!'

সম্বুদ্ধ তীক্ষ্ণ হয়।

বলে, 'ইলার মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে না খুব একটা চিন্তাকাতর। বরং যেন বেশ মজা পেয়েছে মনে হচ্ছে। পাত্রটি বোধ হয় খুব সুকান্তি?'

ইলা ভালোমানুষের গলায় বলে, 'তা সত্যি ফার্স্টক্লাস চেহারা। কথাবার্তা? অতি চমৎকার। বিদেশ-ফেরত ইঞ্জিনিয়ার, বিয়ে করে শীঘ্রই আবার বউ নিয়ে বিদেশে যাবে। অবস্থা ভালো, শিক্ষিত পরিবার, মা-বাপ আছেন, কলকাতায় বাড়ি, গাড়ি—'

ইলা যেন আর কাকে পাত্রের সন্ধান দিচ্ছে। কথা শেষ করতে পারে না।

সম্বুদ্ধ রূঢ় গলায় বলে, 'খুব আপশোস হচ্ছে এখন তাই না?'

ইলা আরও অমায়িক গলায় বলে, 'খু-ব।'

'দুঃখের বিষয়, এক্ষুনি ডাইভোর্স কেস আনতে পারবে না—'

'সেই তো দুঃখ!'

'থাম ইলা', কুমকুম ঝঙ্কার দেয়, 'এখন বসল ইয়ার্কি মারতে। ভেবে দেখছিস না আর বেশি গড়ালে তোর বাবার মুখটা কি রকম পুড়বে? পছন্দ যখন হয়েছে তখন—'

'পছন্দ?'

ইলা হেসে উঠে বলে, 'আজ তো লোকটা রাতে ঘুমোতেই পারবে না।'

'হুঁ। তা, লোকটার নামটা কি?'

'ইন্দ্রনীল। ইন্দ্রনীল মুখার্জী।'

মুখার্জী।

সম্বুদ্ধ ঘোষ যেন ক্রমশই হেরে যাচ্ছে। তার মুখে সেই পরাজিতের কালো ছাপ। তার গলায় ঈর্ষার কুটিলতা।

'থাকে কোথায়?'

'সর্বনাশ? ওইটি বলছি না। কে জানে গুণ্ডা লাগিয়ে ফিনিশ করবার তাল করবে কি না।'

'ঝগড়া রাখ ইলা।'

কুমকুম সামলায়। সামলেই থাকে সখীরা। শ্রীরাধিকার আমল থেকে।

পরামর্শের কথা পাড়ে সে। এবং অনেক বাদ-বিতণ্ডার পর ঠিক হয় কালই সম্বুদ্ধ ইলাদের বাড়ি যাক। পরিচয় দিক। ইলার বাবা যদি মেনে নেন ব্যাপারটা উত্তম, আর যদি অপমান করেন ইলাকে, নিয়ে চলে আসবে সম্বুদ্ধ। তারপর যা হয় হবে। অসীমের বাড়ি রয়েছে, কুমকুমের বাড়ি রয়েছে। অবশ্য এ-সব ফ্যাসাদ কারও অভিভাবক-কুলই পছন্দ করেন না, তব তাড়িয়ে দিতে তো পারবেন না।

আর সম্বুদ্ধর যদি এখানের অফিসেই উন্নতি হয়, থেকে যাক। খুঁজুক একটা ফ্ল্যাট। মা-বাপের নাকের সামনে সুন্দর করে সংসার করুক ইলা।

কাল? কাল থাক।

ইলাই বাধা দেয়।

বলে, 'কাল নয়। দেখি চেষ্টা করে যদি জমিটা কিঞ্চিৎ প্রস্তুত করে রাখতে পারি।'

'যাই করো দেরি করো না—' অসীম বলে, 'ব্যাপারটা ছেলেখেলা নয়। এর সঙ্গে তোমার বাবার মান-সম্মান জড়িত।'

ঠিক এই কথাই ঘণ্টা দুই পরে নীলা বলে, 'সব কিছুই ছেলেখেলা নয় ইলা, মনে রাখিস এর সঙ্গে তোর জামাইবাবুর মান-সম্মান জড়িত। উনি উপযাচক হয়ে তাদের বলেছেন, এখন আবার গিয়ে বলবেন, আমার শালী এখন বিয়ে করতে রাজী নয়।' তুই পাগল হতে পারিস, উনি তো তা হতে পারেন না।'

'বাঃ, পড়া শেষ না করে বিয়ে করব না খুব একটা অযুক্তির কথা বুঝি?'

'খুব। ওটা এমন কিছু বাধা নয়। তাছাড়া এত যদি ইয়ে, আগে কেন বললি না?'

'বলেছিলাম দিদি।'

বলেছিল।

কিন্তু তেমন করে বলেনি, সে-কথা নিজেই জানে ইলা। কোথায় যেন একটা বাসনার কাঁটা ছিল বিঁধে। নইলে সকাল থেকে মনটা এমন উদ্বেলিত হচ্ছিল কেন?

কেন অমন পরিপাটি প্রসাধনে রাজী হয়েছিল? আর কেন লোকটা যখন এল স্পষ্ট সহজ চোখে তাকাতে পারেনি তার দিকে? সে কি শুধুই একটা অস্বাভাবিকতার অস্বস্তি? না, ভালো লাগার সুখ? অথবা ভালো লাগার অসুখ?

'আমি জানি না।' নীলা বলে, 'যা বলবার নিজেই জামাইবাবুকে বল গে।'

'ওরে বাবা, রক্ষে কর।'

'তবে বল গে যা মাকে, বাবাকে। তবে জেন, তোমার বিয়ের মধ্যে আর নেই আমরা।'

হঠাৎ হেসে ফেলে ইলা। বলে 'আচ্ছা।' তারপর চলে আসে।

হেমন্ত আসতেই নীলা ফেটে পড়ে।

'শুনেছ তোমার শালীর আদিখ্যেতার কথা? এখন বলছে রিসার্চ শেষ না করে বিয়ে করবে না।'

হেমন্ত অফিসের পোশাক ছাড়তে ছাড়তে অম্লান গলায় বলে, 'শালীরা অমন বলে থাকে।'

'জানি না। এখনকার মেয়েদের বোঝা ভার। কী দরকার তোমার এর মধ্যে থাকবার?'

হেমন্ত সহজ পোশাকে সুস্থ হয়ে বলে, 'কেন মাথা খারাপ করছ? মেয়েরা অমন দর বাড়িয়েই থাকে। তুমি যেমন শাড়ির দোকানে গিয়ে দামী শাড়িখানায় হাত বোলাতে বোলাতে বল, মোটে কিন্তু বেশি খরচ করবে না, সস্তা দেখে একখানা—'

'বলি আমি ওই কথা?'

'সত্যভাষণের অপরাধে ফাঁকির হুকুম না দিলে বলব, বলে থাকো। তোমার বোনও—'

'আমি তোমার মতো অত ইয়ে নই। আমি বলে দিয়েছি, যা বলবার মাকে বল গে।'

হেমন্ত আরামের হাই তুলে বলে, 'বলবার কিছু নেই। তারা পাকা দেখার দিন ঠিক করে গেছে।'

'পাকা দেখার দিন ঠিক করে গেছে।'

উৎফুল্ল অমলা মেয়েকে দেখেই বলে ওঠেন, 'ওরা যেতে না যেতেই কোথায় বেরোলি? বলে গেলি না?'

'আর বলা। তুমি কি আর তখন আমায় চিনতে পারতে মা?'

অমলা হেসে ফেলেন।

অমলা বলেন, 'তা যা বলেছিস। ওরা তো যাবার সময় পাকা দেখার দিন ঠিক করে গেল।'

অমলার মুখে পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্না।

অমলার কণ্ঠে সপ্তস্বরা বেণুর ঝঙ্কার।...

'এমন ভদ্র জীবনে দেখিনি বাপু। এই যে হেমন্ত, নিজে সে খুব ভালো। বিয়ের সময় কাকা-টাকা খুব ইয়ে করেছিল। কিন্তু এরা যেন আলাদা জাতের। কনের বাপ হাতজোড় করবে, তা নয় ওরাই করছে, 'তাড়াহুড়ো করে আপনাদের খুব অসুবিধেয় ফেলেছি, বুঝছি কিন্তু বড্ড ইচ্ছে'—আমি তোর বাবাকে বলেছি, ওরা ভদ্র, ওরা কিছু চাইবে না, তা বলে তুমি যেন কমে সেরো না। ধারকর্জ করেও সাধ-আহ্লাদ করবে।...তা, গোছালো মানুষ তো। হাসলেন। বললেন, 'মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, এ কি আর আমার মাথায় ছিল না?' তুই বাপু আর অমন রোদে রোদে হটহটিয়ে বেড়াস নে। যখন-তখন বেরনোটাও বন্ধ কর। চেহারাটা একটু ভালো কর।'

অমলার মুখে-চোখে আহ্লাদের ঝিলিক খেলে।

এই অমলার মুখের ওপর বলবে ইলা, 'থামো মা, পাগলামী রাখো। এ-বিয়ে হবে না। বিয়েই দিতে হবে না তোমার ছোটো মেয়ের। বাবার জমানো টাকা খরচ করতে হবে না।'

বলা যায় না।

ইলার মুখ দিয়ে বেরোয় ইলার অভাবিত একটা কথা। 'আর চেহারা ভালো হয়ে কী হবে? খারাপেই তো—'

চলে যায় তাড়াতাড়ি।

অমলা মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন মেয়ের দিকে। যৌবনবতী মেয়ের মধ্যেই তো মা জন্ম নেয় নতুন করে। ইলা অমলার সার্থক স্বপ্ন।

ঘরে এসে বসে পড়ে ইলা।

তবে কি বাবাকে বলবে?

বাবা কি বলবেন? আহত পশুর দৃষ্টি নিয়ে শুধু তাকিয়ে থাকবেন তাঁর সরল ছেলেমানুষ মেয়ের দিকে? না কি, গম্ভীর ক্লান্ত গলায় বলবেন, 'আর ক'দিন আগে বললে আর একটা ভদ্রলোকের কাছে অপদস্থ হতাম না।'

মুখোমুখি বলা যাবে না।

চিঠি লিখে বলতে হবে। তবু ইলার হাত দিয়েই আসুক আঘাত। সম্বুদ্ধর কথাবার্তা নরম নয়, কি বলতে কি বলে বসবে।

কাগজ টেনে নিয়ে বসল।

আর পরমুহূর্তেই একটা অদ্ভুত চিন্তা পেয়ে বসল ইলাকে।

ওরা তো খুব ভদ্র। অমলা বলেছেন জীবনে এমন ভদ্র দেখেননি। সেই ভদ্রতার কাছেই সাহায্য চাক না ইলা। চিঠি সেখানেই পাঠাক। লিখুক 'আপনি ভদ্রলোক, তাই আপনাকে জানালাম। গল্প-উপন্যাসে তো এমন হয়।'

অমলা যেন আহ্লাদের সাগরে ভাসছেন। কত ভয়, কত ভাবনা ছিল, সব কেটে গিয়ে ঝলমলে সূর্যের আলো দেখা দিয়েছে আকাশে, বিচলিত না হয়ে পারছেন না অমলা।

আর কি চায় মানুষ?

আর কি চাইবার আছে?

কৃতী ছেলে, সুন্দর ছেলে, ভদ্র আর মার্জিত ছেলে। তার উপর ব্যবহার-সভ্যতা-কুলশীল-মান-অবস্থা সব প্রথম শ্রেণীর। চাওয়ার অতিরিক্তই।

না, অমলা ভাবতে পারেন না এ-সব পাওয়ার অনেক আগে 'প্রেম' চেয়ে বসে আছে ইলা। তাই ভাবেন, ইলার অনেক ভাগ্য।

তা ভাগ্য পরম বইকি।

ইলার সেই চিঠি তো আর কারও হাতেও পড়তে পারত। অথবা অপমানিত বর ঘৃণায় রাগে সে-চিঠি রাষ্ট্র করতে পারত। কদর্য এক কালিতে ভরিয়ে দিতে পারত ইলার মুখ।

অন্তত একখানা কড়া চিঠির মাধ্যমে বলতে পারত ইলাকে, 'এ-আক্কেলটুকু বড়ো দেরিতে প্রকাশ করা হল না?'

নাঃ, সে সব কিছুই হল না। শুধু অমলার আদর্শ ভদ্র ভাবী জামাই ভয়ানক একটা অভদ্রতা করে বসল। বলে পাঠাল 'মেয়ে পছন্দ হয়নি তার।'

মেয়ে পছন্দ হয়নি!

দুটো সংসারের ওপর অতর্কিতে একখানা থান ইঁট ফেলল যেন ইন্দ্রনীল।

নির্বিবাদে পাকা দেখার আয়োজন হতে দিয়ে, এই দু-তিন দিন ধরে হাস্যমুখে দিদি-বউদিদের হাস্য-পরিহাস হজম করে, এখন বলছে কিনা মেয়ে পছন্দ হয়নি।

ইন্দ্রনীলের বাড়িতে বলল, 'পাগল হয়ে গেছে।' বলল, 'মাথাটা আমাদের হাতে করে কাটালি? কি করে বলব এ-কথা?'

ইন্দ্রনীল শান্ত গলায় বলল, 'কি আর বলবে। বল গে তখন বুঝতে পারেনি।'

'কিন্তু এখনই বা নতুন কি বুঝলি তুই?'

'কি জানি। কেমন যেন ভালো লাগছে না এখন।'

'কনের বাপের ওপর কি বাজটা ফেলা হবে, ভেবে দেখেছিস?'

'ভাবছি তো। কিন্তু মনকে ঠিক করতে পারছি না।'

অতএব ঠিক করা বিয়েটাই বেঠিক হল।

বাজ ফেলা হল করেন বাপের মাথায়।

ফেলতে হল হেমন্তকেই।

বজ্রাহত দম্পতির সামনে বসে থাকতে হল মাথা হেঁট করে।

জামাইবাবুর হেঁটমুণ্ড এই প্রথম দেখল ইলা। তারপর শুনতে পেল জামাইবাবুর বিষণ্ণ গলা।

'ছেলের বাড়ির সবাই তো তাজ্জব হয়ে গেছে।—বলছে, ওকে দেখে মনে হচ্ছে কে যেন ওকে মন্ত্রাহত করে ফেলেছে। নইলে ইন্দ্রর পক্ষে সম্ভব এমন অসম্ভব অভদ্রতা করা?'

না, সম্ভব নয়।

ইন্দ্র বাড়ির সেরা রত্ন। সেই রত্ন নিজের মুখে চুনকালি মেখে ইলাকে রক্ষা করছে চুনকালির হাত থেকে।

কেন? ইলার কে সে?

কেউ নয়, ইলা শুধু তার ভদ্রতার দরজায় হাত পেতেছিল। অথচ সম্বুদ্ধ নিজের গায়ে আঁচটি নিচ্ছে না।

বাড়িতে নিন্দিত হবে বলে, বিয়ের কথা ফাঁস করছে না।

ইলা দাঁতে দাঁত চেপে মঞ্চ থেকে সরে যায়। অমলা ভীত কণ্ঠে বলেন, 'দেখ বাবা হেমন্ত, মেয়ে আবার এ-অপমানে কি করে বসে।'

'না, করবে আর কি?'

হেমন্ত শুকনো মুখে বিদায় নেয়। শ্বশুরবাড়ি থেকে এই প্রথম।

ইলা নিজের ঘর থেকে টের পায় সব।

ইলার বাবা দালানে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন আর মাঝে মাঝে অমলাকে বলছেন, 'দেখ, তুমি মন খারাপ করো না, এ একরকম ভালোই হল, আগেই বোঝা গেল। মানুষ যে কত ছদ্মবেশী হতে পারে, তার নমুনা দেখে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হল।'

অমলা কথা বলেন না, অমলা স্তব্ধ হয়ে ভাবেন, কিন্তু এ ছদ্মবেশের প্রয়োজন কি ছিল তার? কী দরকার ছিল ইলার দিকে অমন আলো-জ্বালা চোখে চাইবার? অমন প্রসন্ন স্মিত হাসি হাসবার?

অমলা ভেবেই নিয়েছিলেন, মুগ্ধ হয়ে ফিরে গেছে সে। হঠাৎ এ কী অদ্ভুত কথা!

মেয়ে পছন্দ হয়নি।

পাত্র-পক্ষের আর সবাই যে-কথা শুনে মাথায় হাত দিয়েছে, সেই কথা উচ্চারণ করেছে সেই পাত্র? অমলা ভাবতে ভাবতে অবশ হয়ে গেলেন।

অমলা আজ রান্না করলেন না।

অনেকটা রাত্রে মেয়ের ঘরে ঢুকলেন অমলা, এক গ্লাস দুধ আর দুটো মিষ্টি নিয়ে।

আস্তে বললেন, 'খেয়ে নে। শরীরটা তেমন ভালো লাগছিল না, আজ আর রান্না করতে পারিনি।'

ইলা উঠে বসে।

আস্তে বলে, 'রমু কি খেল?'

'ও দুধের সঙ্গে পাঁউরুটি খেয়ে শুয়ে পড়েছে।'

'বাবা?'

আরও আস্তে, আরও সন্তর্পণে উচ্চারণ করে ইলা।

'উনিও দুধই গেলেন শুধু। খিদে-তেষ্টা আর নেইও তাঁর। মানুষের দুর্ব্যবহার দেখে পাথর হয়ে গেছেন। কতখানি বিশ্বাস করেছিলেন—'

'মা!'

হঠাৎ একটা আর্ত চিৎকারে মায়ের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ইলা।

চাপা তীক্ষ্ণ স্বরে বলে, 'মানুষ যে কতখানি বিশ্বাসঘাতক হতে পারে তার নমুনা দেখতে অন্য কোথাও যেতে হবে না মা তোমাদের, নমুনা তোমাদের ঘরের মধ্যেই আছে। সেই বিশ্বাসঘাতক, জোচ্চোর দিনে দিনে মাসে মাসে ঠকিয়ে আসছে তোমাদের—'

'কে? কে? কার কথা বলছিস?'

অমলা প্রায় চিৎকার করে ওঠেন, 'কিসের বিশ্বাস?'

'সব, সব কিছুর মা! তোমাদের ভালোবাসার, তোমাদের সম্ভ্রমের, তোমাদের সুনামের, তোমাদের বংশের পবিত্রতার। সব কিছুর বিশ্বাস নষ্ট করেছি আমি। আর ছদ্মবেশে তোমাদের মায়া-মমতা স্নেহ-ভালোবাসা অন্ন-বস্ত্র সব নিয়ে চলেছি।'

অমলা ইলার বিছানার ওপর বসে পড়েন। রুদ্ধকণ্ঠে বলেন, 'কি বলছিস তুই ইলা?'

'যা বলছি সব ঠিক মা। এতদিন তোমাকে জানাতে পারিনি, বার বার বলতে গেছি, পারিনি মা। তোমাদের দেওয়া বিয়ে করবার উপায় নেই আমার।'

'উপায় নেই! উপায় নেই!'

অমলা স্তব্ধ হয়ে গিয়ে বলেন, 'উপায়ের বাইরে চলে গিয়েছিস তুই? বল তবে, খুলে বল কতখানি কালি মাখিয়েছিস আমাদের মুখে।'

'রেজিস্ট্রি করেছে শুধু। অন্য কিছু নয়?'

হেমন্ত হাল্‌কা গলায় বলে ওঠে, 'এতে তো তোমাদের দু'হাত তুলে নাচবার কথা।'

নীলা বিরক্তির ঝঙ্কার তোলে, 'নাচবার কথা?'

'নিশ্চয়! ভেবে দেখ, এটা না হয়ে অপরটা হলে? তাতেও নিরুপায়তা ছিল। তার ওপর ছিল চুনকালি, এতে তো আর মুখে চুনকালি পড়ছে না।'

'পড়ছে না?'

'নো! নো! এ হেন ঘটনা এখন হরদম চলেছে—'

'আর এই যে ঘোষ না কি একটা হতচ্ছাড়া, এতে মা-বাপের প্রাণ ফেটে যাচ্ছে না?'

'ফাটবে না, ফাটার কারণ নেই—এটা ভাবলেই সহজ হয়ে আসে। অবশ্য আমি বলছি না খুব একটা সুন্দর কিছু হয়েছে। আগাগোড়া ব্যাপারটাই না ঘটলে ভালো হত। কিন্তু এও ঠিক, আমরাই

অবস্থাকে অসুন্দরে পরিণত করি।—অনুমোদন পাবে না, এই ভয়েই এই সব কাণ্ড করে বসে ছেলেমেয়েগুলো।'

'পাবেই বা কেন? সব প্রেমে পড়াই অনুমোদনযোগ্য?' নীলা রেগে রেগে বলে।

'আহা, দেবতাটা অন্ধ, এ তো চিরকেলে কথা।'

'অতএব উচিত হচ্ছে সেই অন্ধের হাতে ভাগ্য সমর্পণ করে না বসে, যারা চোখ-কানওলা তাদের হাতে ভাগ্যটাকে রাখা।'

'সে তোমার বলা অন্যায়। এই জগতে চরে বেড়াবে অথচ কোথাও কোনোখানে হোঁচট্ খাবে না, এতটা আশা করা যায় না।'

নীলা গম্ভীরভাবে বলে, 'হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে হোঁচট্ খাব, বাড়ি, সংসার, মা-বাপের মুখ ভাবব না, এমনই যদি অবস্থা হয়, তবে আর শিক্ষার মূল্য কি? শিক্ষার সঙ্গে সংযমের কোনো সম্বন্ধ নেই?'

হেমন্ত হাসে।

বলে, 'কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে 'প্রেম' বস্তুটার যে মহা আড়ি, এমন কথাও নেই।'

'সে কথা বলছি না,' নীলা ক্রুদ্ধ গলায় বলে 'আমি বলছি লুকোচুরি করবে কেন? প্রেমে পড়েছিস পড়েছিস, সাহসের সঙ্গে এসে স্বীকার কর। মানুষ তো ইঁদুর ছুঁচো নয় যে গলি খুঁজে খুঁজে আত্মগোপন করবে?'

হেমন্ত হাসে।

বলে, 'তা অবশ্য ঠিক বলেছ। তবে কি জানো, দেশটার যে আকাশে-বাতাসে ভীরুতা। ভয়..ভয়...ভয়ই গ্রাস করে রেখেছে সমস্ত বুদ্ধি-বৃত্তিকে। আগে ছিল বাপের ভয়, সমাজের ভয়, লোকলজ্জার ভয়, এখন সেগুলো ঘুচেছে, জায়গায় এসে হাজির হয়েছে অভাবে পড়বার ভয়, অসুবিধেয় পড়বার ভয়, ঝঞ্ঝাট পোহাবার ভয়।...এতেই কণ্টকিত। অবিশ্যি এক্ষেত্রে আরও একটা ভয় আছে, সেটা হচ্ছে গুরুজনের স্নেহ হারাবার ভয়। সেই ভয়ের থেকেই—'

'তা আর নয়—'

নীলা প্রায় ধমকে ওঠে, 'বকো না। গুরুজন ভেবে তো অস্থির বাছারা। তাদের স্নেহের ধার ভারী ধারছে!'

হেমন্ত গম্ভীর হয়।

বলে, 'না নীলা, সত্যি! সেটাই বোধ করি প্রধান কারণ। ঊর্ধ্বতনেরা যেদিন অধস্তনদের প্রেমে পড়ায় আঘাত পাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করবে, ঘটনাটাকে সহজ আর স্বাভাবিকতম ব্যাপার বলে গ্রহণ করতে শিখবে, সেদিন থেকেই লুকোচুরি বন্ধ হবে।'

'হবে! বলেছে তোমায়।'

নীলা হেমন্তর কথা মানতে রাজী নয়।

হেমন্ত হেসে ফেলে বলে, 'একটা কাল ছিল জান অবশ্যই, যখন ছেলে তার বিবাহিতা স্ত্রীকে ভালোবাসলেও গুরুজনেরা আহত হতেন। ছেলে যদি তাঁদের অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীকে একখানা শাড়ি কি সামান্যতম কিছু উপহার দিত, তাহলে অপমানের আঘাতে জর্জরিত হতেন তাঁরা। সে-অবস্থা এখন আর নেই, এটাও থাকবে না। শালী যে রেজিস্ট্রিটা করে ফেলেছে, এর জন্যে আমি ওর বুদ্ধির তারিফ করি। যাক, এবার একটা 'ফর-শো' বিয়ে লাগিয়ে দেওয়া যাক।'

নীলা ভুরু কোঁচকায়।

'ফর শো বিয়ে লাগিয়ে দেওয়া যাক?'

'নিশ্চয়।'

'রুচি হবে?'

'হবে না কেন? কত অরুচিকর ব্যাপারকে মাথায় তুলে নিতে হচ্ছে রাতদিন, এ তো বরং আহ্লাদের, মজার।'

নীলা ঠিকরে ওঠে।

নীলা ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'বাবা আবার ঘরের কড়ি খরচ করে বিয়ে দেবেন ওর?'

হেমন্ত ওর রাগ দেখে হো হো করে হাসে।

'কেন নয়? ইতর জনের পাওনাটা মাঠে মারা যাবে নাকি?'

'কেউ আসবে না এ-বিয়েতে।'

'সবাই আসবে।'

'এত ইতরজন কেউ নেই আমাদের আত্মীয়দের মধ্যে।'

'আরে, ওটা তো কথার কথা। মিত্রজনই না হয় বলা যাক। তবে নেমন্তন্নটা মাঠে মারা যেতে দেখলেই বরং অখুশি হবে তারা।'

না, মাঠে মারা যাওয়ার রেওয়াজ আর নেই। ছেলেমেয়ের নির্বুদ্ধিতা, ছেলেমেয়ের কাণ্ডজ্ঞান-শূন্যতা, ছেলেমেয়ের অসাবধানতা, সব কিছুকে ঢেকে নিয়ে, ঘটনাটার একটা সভ্য চেহারা তো দিতে হবে! সভ্য আর সুন্দর। সেটাই সামাজিক মানুষের দায়।

সম্বুদ্ধ ঠিকই বলত, ওইখানেই গার্জেনরা জব্দ।

জব্দ বইকি! শুধু মমতার কাছে নয়, এই সভ্যতা শোভনতার কাছেই জব্দ। ঘরের মেয়েটা কোনো কিছু না হঠাৎ একদিন আর একটা ঘরে 'ঘর' করতে শুরু করে দিল, এই কটু দৃশ্যটার হাত এড়াবার জন্যেই বিবাহিত দম্পতিকে নিয়ে আবার বিয়ের পিঁড়িতে বসাতে বসেন তাঁরা। হাস্যকর ছেলেমানুষী, তবু তাই দিয়েই সম্ভ্রম বজায় রাখা। তা, নায়ক-নায়িকার অলাভ কিছু নেই এতে। ডবল বিয়ের সুযোগে যথারীতি পাওনাগুলো এসে যায় হাতে।

মা-বাপ ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজন, এদের হৃদয়ে সাধ-আহ্লাদও তো থাকে!

চিরদিনের সংস্কারে লালিত আজন্মসঞ্চিত সেই সাধগুলি এই হাস্যকর ছেলেমানুষীর মধ্য দিয়েই বিকশিত হবার পথ পায়।

চির-আদরিণী মেয়েটা, একটু ভুল করে ফেলেছে বলে শূন্য হাতে বিদায় নেবে?

তার যে ভারি শখ ছিল অনেক শাড়ি-গহনার। কবে যেন কার বিয়েতে সোনালী ফুলদার সবুজ বেনারসী দেখে মোহিত হয়েছিল, উচ্ছ্বসিত হয়েছিল কার গলায় যেন সেকেলে গড়নের পুষ্পহার দেখে। তার কিছু হবে না? তাছাড়া ছোটোখাটো আরও কত বাসনাই তো ব্যক্ত করে থাকে মেয়েরা, তাদের বস্তুলুব্ধ বাসনাময় হৃদয়ের।

'বিয়ের সময় হবে, বিয়ের সময় দেব,'—বলে ঠেকিয়ে রাখে মধ্যবিত্ত ঘরের গৃহিণী মা।

সেই ঠেকিয়ে রাখাটা বিঁধতে থাকে কাঁটার মতো মায়ের প্রাণে।

বিয়ের সময় তাই মাকে আর ঠেকানো যায় না। তা, সে-বিয়ে যদি প্রহসনও হয়।

'প্রহসন বইকি—'

তাই বলেছিলেন ইলার বাবা। আর বলেছিলেন, 'সত্যিই কি প্রয়োজন এই প্রহসনের? অগ্নি-নারায়ণ সাক্ষী করে কন্যা-সম্প্রদানের কার্য করতে বসব আমি হেমন্ত?' চির-শান্ত, চির-সংযত মানুষটার কণ্ঠে এই জ্বালার সুর শুনে অপ্রতিভ হয়েছিল হেমন্ত। তবু ঘাড় চুলকে বলেছিল, 'ফার্স কেন বলছেন? ছেলেবুদ্ধিতে একটা বাঁদরামী করে ফেলেছে—'

'এম-এ পাস করেছে ইলা, একুশ বছর বয়েস হয়ে গিয়েছে ওর হেমন্ত। ছেলেমানুষ বলা মানে মনকে চোখ ঠারা।'

'তবু দেখুন ছেলেমানুষ ছাড়া আর কি? এমনটা করেছে কেন নইলে?'

ইলার বাবা পায়চারি করতে করতে বললেন, 'আমার এখন কি মনে হচ্ছে জান হেমন্ত, সেই তোমার বন্ধুর ভাইপো, বোধ করি কোথাও থেকে কানাঘুষো কিছু শুনে থাকবে, তাই—'

'অসম্ভব নয়।'

'সেই ছেলেটিকে যে আমি আপন করতে পেলাম না, এ-দুঃখ আমার চিরকাল থাকবে হেমন্ত।'

হেমন্ত স্বভাবগত কৌতুকে বলতে যাচ্ছিল এমন একটি সোনারচাঁদ জামাই থেকেও আপনার দুঃখমোচন হবে না? বলতে পারল না। ওই আহত বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল।

তবু চলতে লাগল প্রহসনের আয়োজন।

পাকা দলিলটা নিতান্তই কাঁচা চেহারা নিয়ে কাঁচুমাচু হয়ে পড়ে রইল প্রহসনের নায়ক-নায়িকার গোপন ভাণ্ডারে।

পাঁচজনে জানল শুধু 'প্রেম'।

চমকাবার কিছু নেই, চমকালও না কেউ। বড়োজোর নিমন্ত্রণপত্রে পাত্রের নাম শ্রীমান সম্বুদ্ধ 'ঘোষ' দেখে ইলার বাবার ব্রাহ্মণ আত্মীয়রা একটু মুখ টিপে হাসল মাত্র।

নিমন্ত্রণে আসবে না, এ-কথা ভাবতেও পারল না কেউ।

ভাববে কোন্ সাহসে? কার ঘরের দেয়ালে সিঁধ কাটা হচ্ছে, অথবা হবে, কে বলতে পারে?

সম্বুদ্ধর কাছে পরদিন গিয়েছিল ইলা, গম্ভীর মুখে বলেছিল, 'ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছি, যাও, গিয়ে বল গে। ন্যাকামী করবে না, ঔদ্ধত্য করবে না, আর একবার বিয়ে দিতে চাইলে আপত্তি করবে না—বুঝলে?'

'আর একবার বিয়ে!'

ইলা আরও গম্ভীর হয়, হ্যাঁ। চিরাচরিত প্রথায় যথারীতি বিয়ে। সেটাই করতে হবে। যেতে হবে আমার জন্যে টোপর পরে জাঁতি হাতে নিয়ে। এতেও যদি বল 'বাড়িতে জানতে পারবে, তাহলে আমার সঙ্গে এই শেষ।'

সম্বুদ্ধ বিদ্রূপ করে বলে, 'তারপর? যথারীতি বিয়েটা সেই ভাগ্যবান ইন্দ্রনীল মুখার্জীর সঙ্গে নাকি?'

'থামো! তার নাম মুখে এনো না তুমি।'

'উঃ, মেজাজ যে সপ্তমে! যথারীতি বিয়েতে আমার আর আপত্তি কি? বরং তো লাভই। শ্বশুরের মেয়েটাই পাচ্ছিলাম শুধু শ্বশুরের দেওয়া যৌতুক, শ্বশুরবাড়ির আদর, এগুলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলাম। সেগুলো উপরি পাওনা হচ্ছে। বাবাকে বল, ঘড়িটা যেন ভালো কেনেন।'

'হাসতে তোমার লজ্জা করছে না?'

'কী মুশকিল, লজ্জা করবে কেন? বরং খাট-বিছানা আলমারি-আয়না সব কিছুর আশাই তো করছি সাগ্রহে।'

ইলা তীব্রস্বরে বলে, 'পাবে। সব কিছুই পাবে সম্বুদ্ধ ঘোষের জন্যে হোক না হোক, মা-র ছোটো জামাইয়ের জন্যে সবই গেছে গড়তে।'

তা গেছে।

অনুষ্ঠানের ত্রুটি হচ্ছে না সত্যিই।

খাতার মাঝখানের বিদীর্ণ অধ্যায়ের পৃষ্ঠাটা উলটে ফেলে নতুন অধ্যায়ে চোখ ফেলা হয়েছে।

নীলা রাগ ভুলে মহোৎসাহে বিয়ের বাজার করে বেড়াচ্ছে, অমলা নতুন নতুন ফর্দ লিখছেন।

ইলার বাবা সেকরার দোকানে আর ফার্নিচারের দোকানে হাঁটাহাঁটি করছেন, হাঁটাহাঁটি করছেন বরের বাড়ি।

সম্বুদ্ধর দাদা-বউদি এখন আর নিরপেক্ষ নেই, বিয়ের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হয়েছেন। আর সম্বুদ্ধকেও এই সেকেলে বাড়ির সেকেলেপনার মধ্যেই বেশ মিশে থাকতে দেখা যাচ্ছে।

গায়ে-হলুদ দিতে বসে মামাতো বউদি যখন দু'গালে হলুদ লেপে দিল, তখন সম্বুদ্ধ ছিটকে বেরিয়ে গেল না, শুধু একটু কোপ দেখাল। দধিমঙ্গলের চিঁড়ে-দই নিয়ে ওরা যখন হাসাহাসি করল, সম্বুদ্ধ হাসতে হাসতে ওদের মাথায় মাখিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেল।

এই সব দিদি-বউদিদের যে সম্বুদ্ধ 'মানুষ' বলে গণ্যই করত না, সেটা এখন অন্তত মনে পড়ল না।

আবার বড়োবউদি তাঁর মস্ত বড়ো আইবুড়ো মেয়েকে বরযাত্রী পাঠাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেন না, দাদা উপবাস করে নান্দীমুখ করতে আপত্তি করলেন না।

সকলেরই যেন মনোভাব, হাতছাড়াই তো হয়ে গিয়েছিল, সেই হাতছাড়া বস্তু আবার যদি হাতে ধরা দিয়েছে তো আমোদটা ছাড়ি কেন?

আর ইলা?

সে-ও কি সম্বুদ্ধর মতোই লজ্জার বালাই ত্যাগ করে উৎসবে মাতে? দিদির সঙ্গে মার্কেটিং করতে যায়? মায়ের সঙ্গে গহনার প্যাটার্ন নিয়ে আলোচনা করে?

নাঃ, ইলা একেবারে চুপচাপ হয়ে গেছে।

ইলার এই স্তিমিত মূর্তি দেখে ইলার মাকে ইচ্ছার অধিক উৎসাহ দেখাতে হয়, ইলার বাবাকে মৌনব্রত ভাঙতে হয়। আর ইলার জামাইবাবুকে নতুন নতুন ঠাট্টা আমদানী করতে হয়।

জলি মেয়েটা মনমরা হয়ে বেড়াচ্ছে, এও তো দেখা যায় না।

অবশেষে আসে সেই দিন।

মহলার শেষে অভিনয়ের।

'বিয়েতে কোনো অনুষ্ঠান হল না', এ-আক্ষেপ আর থাকে না ইলার।

সেই একটা রোদ্দুরের দুপুরে যত কিছু আক্ষেপ জমে উঠেছিল তার, সব বুঝি ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন করে দেবার পণ করেছে ইলার সংসার, ইলার পরিজন।

প্রদীপ জ্বেলে নতুন বেনারসী শাড়ি পরে 'আইবুড়ো-ভাত' খায় ইলা, কোরা লালপাড় শাড়ি পরে গায়ে-হলুদ নেয়। কলাতলায় দাঁড়িয়ে সাত এয়োর মঙ্গলকামনা জড়ানো হলুদমাখা সুতো জড়ায় হাতে, অধিবাসের পিঁড়িতে গিয়ে ঘাম-ঘাম হলুদ-হলুদ মুখ নিয়ে, যে পিঁড়িতে অনেক শিল্পকলার নমুনা দেগে রেখেছে অমলার এক ভাইঝি।

ইলার বাবা মেয়েকে পাশে বসিয়ে অধিবাস দ্রব্যের কল্যাণস্পর্শে পবিত্র আর মহান করে তোলেন তাকে। পবিত্র আর পরিচিত অনুষ্ঠানগুলি অনুষ্ঠিত হতে থাকে পরপর।

সন্ধ্যায় কনে-চন্দন পরে ইলা, পরে ফুলের মালা। পরে ওর অনেকদিনের পছন্দর রুপোলী তারাফুল দেওয়া লাল বেনারসী শাড়ি। 'মোনামুনি' ভাসিয়ে বেঁধে দেওয়া হয় ইলার গলায়, ইলা স্পন্দিত রুপোলী বুক নিয়ে চণ্ডীপুঁথি কোলে নিয়ে বসে থাকে অনেকগুলো সুখী দম্পতির নাম লেখা আর একখানা ভারী পিঁড়িতে। এই পিঁড়ি নিয়েই সাতপাক ঘোরাবে সবাই ইলাকে নিয়ে বরকে ঘিরে ঘিরে।...

শাঁখ বাজে একসঙ্গে একজোড়া, নারীকণ্ঠ বাজে উলুধ্বনি হয়ে, সানাই বাজে করুণ সুরে।

আলো জ্বলে, বাড়ি সাজানো হয়, ফুলের গন্ধে আর সেন্টের গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

নিমন্ত্রিত-নিমন্ত্রিতারা সন্ধ্যার আগে থেকেই দলে দলে আসতে শুরু করেন, তাঁদের উদ্দাম কলকাকলী আর শাঁখ-উলুর শব্দ একত্রিত হয়ে উৎসব সমারোহের চেহারা আনে। সামিয়ানা-খাটানো ছাদ থেকে ভেসে আসে চপ আর লুচি ভাজার গন্ধ।...

চিরদিনের দেখা 'বিয়ে বাড়ি' মূর্তি ধরে দেখা দেয় ইলার সামনে।

তারপর আসে বর।

চিরদিনের বরবেশে।

চেলির জোড় আর টোপর পরে, নতুন গরদের পাঞ্জাবীর উপর গোড়ে মালা চাপিয়ে।

'স্ত্রী-আচারে'র কলহাস্যময় মঙ্গলকর্মের মধ্যে নাপিত এসে জাঁকিয়ে দাঁড়ায়...বর-কনের মাথার উপর নতুন উড়ুনির ছাউনি বিছিয়ে দিয়ে চিৎকার করে ওঠে 'ভালোমন্দ লোক থাকো তো সরে যাও—'

এই গালাগালির ছড়া আওড়ানোর মধ্যেই নাকি 'শুভদৃষ্টি' করার রেওয়াজ।

শুভদৃষ্টি?

তা, সে-প্রহসনও হয় বইকি। হবে না কেন, নাটক যখন মঞ্চস্থ করা হয়েছে, তখন পঞ্চাঙ্কের কোনো ভঙ্ক, নবরসের কোনো রস, বাদ দেওয়া তো চলতে পারে না।

বাদ দেওয়া চলতে পারে না, তাই ইলার বাবা উপবাস-ক্লিষ্ট দেহে অগ্নি-নারায়ণ সম্মুখে নিয়ে বরের হাতের উপর কনের হাত রেখে উচ্চারণ করেন কন্যা-সম্প্রদানের পূত পবিত্র বৈদিক মন্ত্র।

তারপর বাসরে এসে বসে বর-কনে।

হোটেলের ভাড়া-করা বহুজন-ব্যবহৃত অশুচি শয্যা নয়, অমলার অনেক সাধ আর পছন্দ দিয়ে তৈরি নতুন রাজশয্যা।

এই শয্যা, এই ফুল, এই মাধুর্য, এই সৌন্দর্য, এই পবিত্রতা সব কিছুই তাদের হাত থেকে এসেছে, যাদের এরা সন্দেহ করেছে, ঘৃণা করেছে, বিদ্বেষ করেছে।

দীর্ঘদিনের কৃচ্ছ্রসাধনের বিনিময়ে সঞ্চয় করে তোলা অর্থের রাশি জলস্রোতের মতো ব্যয় করেছেন তাঁরা এই একটি রাত্রির উৎসবকে কেন্দ্র করে। যে-উৎসবের কেন্দ্রবিন্দু বাড়ির সেই আটপৌরে মেয়েটা। এত মূল্যবান ছিল সে? তা, এই অকাতর ব্যয়ের মধ্য দিয়েই তো মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতার প্রকাশ, পিতৃহৃদয়ের অনুচ্চারিত স্নেহবাণীর সোচ্চার ঘোষণা।

বস্তু দিয়েই তো বস্তুকে বোঝানো। দৃশ্য দিয়ে অদৃশ্যকে অনুভবে আনা। তাই না ঈশ্বরকে উপলব্ধিতে আনতে মাটির প্রতিমা!

হয়তো এরপর থেকে অমলা বাজার-খরচ কমিয়ে দেবেন, কমিয়ে দেবেন গোয়ালার খরচ। হয়তো ঘরে সাবান কেচে ধোপার খরচ কমাবেন।

নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত শাড়ি কিনবেন না একখানাও, প্রয়োজনের উপযুক্ত ওষুধপত্র।

আরও বহুবিধ কৃচ্ছ্রসাধনের কাঠবিড়ালী দিয়ে আবার বেঁধে তুলতে চাইবেন এই একরাত্রির বেহিসেবী অপচয়ের সমুদ্র।

অথচ এত সব কিছু না করলেই পারতেন অমলারা। অমলা আর অরবিন্দ। অনায়াসেই গা ঝেড়ে দিয়ে বলতে পারতেন, 'এত পারব না।'

বলতে পারতেন, 'কেন করব এত?'

ভাবতে পারতেন, ওই দশ-বারো হাজার টাকা থাক তাঁদের ভবিষ্যতের সংস্থান। মিথ্যে একটা নাটকের পিছনে ঢালব কেন?

তা বলেননি, তা ভাবেননি।

বাসর-জাগানীরা বিদায় নিলে সম্বুদ্ধ চুপিচুপি বলে, 'দেখেশুনে বুঝতে পারছি, এযাবৎ বড়োদের ওপর সন্দেহ করে অন্যায়ই করেছি।'

ইলার কাছ থেকে হয়তো উত্তরের প্রত্যাশা করে। না পেয়ে একটু পরে বলে, 'কি বল ঠিক বলছি না? সন্দেহ না করলে এত দিনের এত কষ্ট পাওয়ার কিছুই পেতে হত না। ভয় করে, সন্দেহ করে, নিজেরাই ঠকেছি এতদিন বোকার মতো।'

তবু উত্তর আসে না ইলার কাছ থেকে।

এখনও বোকার মতোই কাজ করে সে।

পুরানো পরিচিত অভ্যস্ত বরের সামনে কাঠ হয়ে বসে থাকে, অপরিচিত বরের কনের মতো।

'কি হল? নতুন হয়ে গেলে নাকি?'

সম্বুদ্ধ বিরক্তির হাসি হেসে নিরঙ্কুশ দাবির হাতে ঈষৎ আকর্ষণ করে ইলার কমনীয় তনুখানিকে। কিন্তু কমনীয় তনু নমনীয়তা হারাল নাকি? কই, আবেশে বিগলিত হয়ে এলিয়ে পড়ছে না তো সেই প্রিয় পরিচিত বক্ষে? যে-বক্ষ এতদিন অধিকারে এসেও দুর্লভ ছিল।

কাঠ হয়ে বসে আছে।

সম্বুদ্ধ বিরক্তিটাকে প্রখর না করে পারে না।

বলে, 'মনে হচ্ছে যেন চিনতে পারছ না। খুব খারাপ লাগছে বুঝি?'

ইলা এই বিরক্তির কণ্ঠে সচেতন হয়।

ইলার মনে পড়ে, নাটকের প্রধান নায়িকার ভূমিকা তার। তাই এবার একটু আবেশের হাসি হেসে বলে, 'রাগ কেন? এতরকম নতুনের মধ্যে একটু বুঝি নতুন হতে ইচ্ছে করে না?' বলে।

যদিও জানে ইলা, নতুন হতে দেবে না সম্বুদ্ধ। রাখতে দেবে না সামান্যতম সহিষ্ণুতার দূরত্ব। একেবারে নিবিড় করে পেতে চাইবে এখনি, এই মুহূর্তে। ইলা সেই প্রবল দাবি ঠেকাতে পারবে না।

তবু ইলা অনুভব করছে সেই নিবিড় বন্ধনের সুর যাবে কেটে। একখানা ছবির মুখ অবিরত ছায়া ফেলবে ইলার মনে, ইলার জীবনে।

হয়তো সারা জীবনে।

ইলা কি কোনোদিন একেবারে বিস্মৃত হয়ে যেতে পারবে সেই আহত মুখের ছবির ভাবনা? যে-মুখ ছোট্ট একটি চিঠির কয়েকটা লাইনের নির্লজ্জ আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গিয়েও সেই নির্লজ্জতার কলঙ্ককালি নিজের ললাটে মেখেছে শুধু ইলাকে এক অপরিসীম লজ্জা থেকে বাঁচাতে।

ইলার চলার পথে পথে যত মুখ আসবে যাবে, তাদের মধ্যে কি প্রত্যাশার দৃষ্টি ফেলে ফেলে দেখবে না ইলা?

আর ইলার জীবনে, কারণে অকারণে, হেলায় খেলায় যত নাম আসবে, ইলা কি তার মধ্যে খুঁজবে না সেই সুন্দর আর বিশেষ নামটা?

আর অবাক হয়ে ভাববে না, আশ্চর্য! এত লোকের ভিড় পৃথিবীতে, এত নামের ধ্বনি, তবু—!

—ঃ ঃ—